হিন্দু সম্প্রদায়
কেন দেশত্যাগ করছে
সালাম আজাদ

হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে
সালাম আজাদ

হিন্দু সম্প্রদায়
কেন দেশত্যাগ করছে

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বারকোটি নাগরিকের এই দেশে হিন্দু জনসংখ্যা বর্তমানে ১,২৪,১৯,১৯৫। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত জনগণনার হিসেবের গড় করে দেখা গেছে প্রতিদিন ৪৭৫ জন এবং প্রতিবছর ১, ৭৩, ৩৭৫ জন হিন্দু চিরদিনের জন্যে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন নাগরিক এদেশ ছেড়ে চলে না যেতেন তাহলে বাংলাদেশে এখন হিন্দু জনসংখ্যা দাঁড়াত সোয়া তিন কোটিতে এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সাংস্কৃতিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হতে পারতো আরো উর্বর, আরো সমৃদ্ধ, আরো মেধাবী।

কিন্তু কেন তারা চলে যাচ্ছেন ? হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের মূলত পাঁচটি কারণ- সম্প্রদায়িক নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক হামলা, অর্পিত সম্পত্তি আইন, দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, সরকারি চাকরিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে-এ গ্রন্থে। বইয়ের শেষ অংশে রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পরিসংখ্যান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রশ্নে সবশেষে রয়েছে কিছু প্রস্তাব।

এই রকম বই এর আগে কেউ লেখেন নি, কারও এত সাহস হয় নি। – অন্নদাশঙ্কর রায়

উৎসর্গ

সহেলী

ক্রান্তিকালে যে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু
সংশয়ের দিনে যার বিশ্বাস একবিন্দুও টলেনি

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশ্বজিৎ রায় একদিন আমার সঙ্গে গল্প ক'রে, খেলাধূলা ক'রে সমস্ত বিকেল কাটিয়েছিল। পরদিন সে স্কুলে এলো না, তারপর দিনও না। দু'দিন পরে বিশ্বজিৎদের বাড়িতে খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম, সে চলে গেছে। কোথায় গেছে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ওর জনৈক প্রতিবেশী অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন,'ইন্ডিয়া'। আমার সেই কচি বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল, প্রিয় বন্ধুকে হারানোর কষ্টে। চব্বিশ পরগনায় পৌঁছে বিশ্বজিৎ আমাকে চিঠি লিখেছিল, না বলে যাবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিল; ক্ষমাও চেয়েছিল সেই চিঠির মাধ্যমে। লক্ষীকান্ত মণ্ডলের কেয়ার অফে আমিও তাকে চিঠি লিখেছি।

কিন্তু আমার মনে সেদিন যে প্রশ্নটি জেগেছিল তা যে কোন জনের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। বিশ্বজিৎ আমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবুও যাবার আগে আমাকে বলে গেল না কেন? বিশ্বজিৎরা তাদের বাড়িঘর, আত্মীয় বন্ধুদের ফেলে চলে যায় কেন? যাবার সময় কাউকে বলে যায় না কেন? পরবর্তীকালে হিন্দু অধ্যুষিত বিক্রমপুরের অসংখ্য হিন্দু পরিবারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে দেখেছি। বিক্রমপুর আমার জন্মভূমি, আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান। যারা চলে গেছেন তাদেরও জন্মভূমি, হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। এই জন্মভূমি, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছেড়ে কেন তারা চলে যায়?

সেদিনের সেই 'কেন' আমাকে আজ এই বই লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ-দেশের অনেক সম্পন্ন হিন্দু পরিবারকে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মানবেতর জীবন যাপন করতে দেখেছি। তাদের সে জীবন আমার চোখ সহ্য করতে পারেনি। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে চোখ সরিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু চোখ সরিয়ে নিলেও মন সরেনি। বুক দুমড়ে, চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এসেছে। তাদের সেই সব দুঃসহ জীবনের জন্যে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে। বার বার তাদের বলতে ইচ্ছে করেছে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসতে। কিন্তু বলার সাহস হয়নি। কারণ আমি তো তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারব না। তাদের স্ত্রী কন্যাদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তো শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন তুলে নিতে পারবো না। আমি কি পারবো দেবোত্তর সম্পত্তি দখল রোধ করতে? মন্দিরে, হিন্দু বাড়িতে, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হামলা ঠেকানো কি আমার পক্ষে সম্ভব? হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালানো হচ্ছে তা কি বন্ধ করা সম্ভব? মেধাবী হিন্দু ছেলেটিকে কি আমি যোগ্যতানুসারে একটি সরকারি চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারি? 'মালাউন' বলে এদেশের হিন্দুদের যেভাবে গালাগালি করা হয় আমি কি তা বন্ধ করতে পারি?

এদেশের হিন্দুরা এখন আর ধুতি পরেন না। তারা ধুতি পরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও কেউ পরেন, উৎসব পার্বনে। কিন্তু তাও কদাচিৎ। অথচ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এদেশের বাঙালীদের এক সময়ের নিত্যদিনের পোশাক ছিল ধুতি। আর এই সামান্য ধুতি পড়ার অপরাধে (?) আমার বিচার চাওয়া হয়েছিল। দল পাকিয়ে হিন্দুদের এই পোষাক পড়ার অপরাধে বিচার চেয়েছিল আমার সেই প্রিয় বিক্রমপুরের তথাকথিত মুসলমানরা। অথচ আমার পূর্বপুরুষ, আমার বাবা, আমার দাদার প্রাত্যহিক পোশাক ছিল ধুতি। আমার বাবাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। সেই বাবার সন্তান হয়ে ধুতি পড়া অপরাধ হয়ে যায়! দেশের পরিবেশ বদলে গেছে, কলুষিত হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক পরিবেশে নিঃশ্বাস নিতে এখন মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এদেশের মানুষ বাঙালী পরিচয়ে গৌরবান্বিত বোধ করতো। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও হয়েছিল বাঙালী পরিচয়ে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান পরিচয়ে নয়। কিন্তু বাঙালী পরিচয় দেয়ার পথকে রোধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হয়েছে। এদেশ শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে। যদি তাই হয়, তাহলে এদেশের অপর দু'কোটি বাঙালী নাগরিক কোথায় যাবে?

যে কোন দেশের উন্নতির পূর্বকথা হচ্ছে সব সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সমান অধিকার প্রদান করা। অর্থাৎ সেক্যুলার সংবিধান। যে দেশের সংবিধানে সেক্যুলারিজম নেই সে দেশে মৌলবাদীদের উত্থান ঘটে দ্রুত। মৌলবাদ সবদেশে, সর্বকালে প্রগতির অন্তরায়। এরা মধ্যযুগের হায়েনা। বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থানের পথকে সহজতর করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজম ছুরি চালিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দুই কোটি মানুষ হয়ে পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর রাষ্ট্র-ধর্ম ইসলাম করার ফলে তাদের আরো এক ধাপ নীচে নামিয়ে দেয়া হয়। এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে পড়ে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার তাদের প্রথম বাজেটে ধর্মীয় খাতে যেখানে বরাদ্দ করেছে ১৬,৬২,১৩,০০০ টাকা। সেখানে দুই কোটি সংখ্যালঘু নাগরিকের জন্যে কোন বরাদ্দ রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। আর ১৯৯৪-১৯৯৫ বাজেটে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উন্নয়নখাতে বরাদ্দ করেছে ১৫,৪৬,৪২,০০০ টাকা, যার সম্পূর্ণটাই মুসলমানদের জন্য। যদিও সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু জনসংখ্যার অনুপাত ৭ : ১। সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে অসংখ্য বৈষম্যের ঘটনার এটা একটি উদাহরণ মাত্র। বলা বাহুল্য সংবিধানের পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীর কারণেই এই বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ করা সম্ভব হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ও নাগরিকদের সম অধিকারের লক্ষ্যে এই সংশোধনী দুটি অচিরেই বাতিল করা একান্ত দরকার।

বাংলাদেশ থেকে সব সম্প্রদায়ের নাগরিকই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে থাকে। এমনকি ভারতেও। দিল্লী ও পশ্চিমবঙ্গে অনেক বাংলাদেশী মুসলমানকে দেখেছি যারা সেখানে দিনমজুর, ফেরিওয়ালা, রিকশা চালনা থেকে শুরু করে নানা রকমের কাজ করে

উপার্জিত অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে আসে। কিন্তু এদেশ থেকে যে সকল হিন্দু ভারতে চলে গেছেন তাঁদের কেউ ফিরে এসেছেন এরকম উদাহরণ আমার জানা নেই। এদেশের মুসলিম নাগরিকরা ভারতে যায় অর্থনৈতিক কারণে। যেমন গিয়ে থাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে। আর হিন্দু নাগরিকরা চলে যায় না; চলে যেতে বাধ্য হয় বৈষম্যমূলক আচরণ ও সাম্প্রদায়িক কারণে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাদের তাড়িয়ে বেড়ায় ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত।

এরকম একটি বই লেখা আমার অভিপ্রায় ছিল না। লেখার পক্ষপাতিও আমি নই। এদেশের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং তাদের মদত দাতা সরকারগুলো এই বই লেখার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। এই বইটির প্রতি পাতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বুকের রক্ত, চোখের জল মিশে রয়েছে। এ রকম ক্ষেত্র যেন আর তৈরি না হয়। এভাবে যেন হিন্দুদের বুকের রক্ত, চোখের জল না ঝরে এবং তা নিয়ে আর একটি শব্দও যেন কেউ লেখার জন্য বিবেকী তাগিদ বোধ না করেন, তাহলেই এই গ্রন্থের সার্থকতা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের মূলত: পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক হামলা, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন, দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, সরকারি চাকরিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান। এর পরের পরিচ্ছেদ হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পরিসংখ্যান। সব শেষে প্রস্তাব উপশিরোনামে কিছু সুপারিশ রাখা হয়েছে– যা বাস্তবায়িত হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

গ্রন্থের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহবধূ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিচারপতি, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ব্যাংকার, সরকারি কর্মকর্তা, এন. জি. ও. কর্মী এবং সমাজের বিভিন্ন পেশার অসংখ্য মানবতাবাদী ব্যক্তি আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবার কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-এর অন্যতম কর্ণধার অগ্রজ প্রতিম শ্রী সবিতেন্দ্রনাথ রায় (ভানু রায়) এই গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সালাম আজাদ

বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। তবে কি হয়েছে অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পরে, সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়ার পরে, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণার পরে, কিংবা উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় অথবা চট্টগ্রামে, ভোলায়, ফরিদপুরে, ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের এই বাংলাদেশে ? প্রতিদিন এদেশের হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে, নির্যাতন চালানো হচ্ছে – তা কি দাঙ্গা নয় ?

দাঙ্গা হয় দুই পক্ষে। কিন্তু এখানে এক পক্ষ নীরব থেকেছে। মার খেয়েছে। পালিয়ে বেড়িয়েছে। অপর পক্ষ মেরেছে। এক সম্প্রদায়ের উপর অপর সম্প্রদায় হামলা করেছে। হিন্দু সম্প্রদায় মার খেয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলবাদী গোষ্ঠীর হাতে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাকে কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা সঙ্গত নয়। সাম্প্রদায়িক হামলা, সাম্প্রদায়িক নির্য়াতন বলাই যৌক্তিক।

বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন প্রতিদিন ঘটছে। কখনো সরবে, কখনো নীরবে। সেই ব্যাপক সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাবলীর আংশিক, না ঠিক আংশিক নয় শতাংশেরও কম ঘটনা 'সাম্প্রদায়িক হামলা' এবং 'সাম্প্রদায়িক নির্যাতন' শিরোনামে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ঘটনাক্রম ১৯৮৯-৯৭। এ রকম হাজার হাজার ঘটনা, অত্যাচার নির্যাতনের বেদনাদায়ক কাহিনী সংগ্রহ না করার কারণে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং এন. জি. ও. কর্মীদের কাছ থেকে এসব ঘটনার অধিকাংশ সংগ্রহ করেছি। কিছু কিছু ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্যে ঘটনাস্থলে যেতে হয়েছে। সে সব জায়গায় গিয়ে ঘটনার ভয়াবহতা দেখে আহত হয়েছি, নাড়া দিয়েছে আরো গভীরভাবে।

হিন্দু সম্প্রদায়
কেন দেশত্যাগ করছে

॥ ১ ॥

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দুদেরকে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই নির্যাতনের ধারা দুটি - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্যাতনের শতাংশও দেশবাসী জানতে পারে না। আর পরোক্ষ নির্যাতনের খবর তো সংবাদপত্রেই আসে না। নির্যাতিত মানুষটি নিজের এবং পরিবারের মানসম্ভ্রম এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবনরক্ষার প্রয়োজনে নির্যাতনের কথা গোপন রাখতে বাধ্য হয়। ফলে সে সব নির্যাতনের খবর ছাপার অক্ষরে আসে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশীও জানতে পারে না। পরোক্ষ নির্যাতনে, মানসিক নির্যাতনে অত্যাচারিত এদেশের প্রতিটি হিন্দু।

সাম্প্রতিককালের (এপ্রিল ১৯৯৫) মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার হরপাড়া গ্রামের একটি নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করব। হরপাড়া গ্রামের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী তুলসীরাণীকে তার বাবা মা ও গ্রামবাসীর সম্মুখ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। মেয়েকে অপহরণের পর তুলসীর বাবা গ্রামবাসীদের কাছে আকূল আবেদন জানাচ্ছেন এই বলে যে, সন্ত্রাসীদের কোন বিচার হোক এটা তিনি চান না, তিনি শুধু মেয়েকে ফেরত চান। কিন্তু গ্রামবাসীরা সন্ত্রাসীদের কোন বিচার করতে পারেনি। তুলসীকেও ফেরত দিতে পারেনি। তুলসীরাণীর বাবা শেষ পর্যন্ত শ্রীনগর থানায় মামলা দায়ের করেন। অপহরণকারীদের নামধাম জানা সত্ত্বেও তুলসীর বাবা ভয়ে তাদের নাম মামলার ডায়েরীতে উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু মেয়ে ফেরত পাওয়ার জন্যে পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন। সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ না করার পরেও এই মামলা করার অপরাধে (?) তুলসীরাণীর পরিবারকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে অপহরণকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মামলা তুলে নেয়ার জন্য তুলসীর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। উপরের মহলের চাপে শেষ পর্যন্ত পুলিশ তুলসীরাণীকে উদ্ধার করেছে বটে। কিন্তু এই ঘটনায় শুধু হরপাড়া গ্রামের হিন্দুরা শঙ্কিত,তা নয়। পত্রিকায় তুলসীরাণী অপহরণের সংবাদ পড়ে বাংলাদেশের প্রতিটি হিন্দু শঙ্কিত ।

যশোর জেলার মনিরামপুর থানার বাকোলপোল গ্রামের পিতৃহীনা কুমারী নমিতা রাণী দাসকে অপহরণ করা হয়। পনের বছর বয়স্ক নমিতা ১৯৮৯ সনে এস. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকবার অবহিত ও যোগাযোগ করার পর নমিতাকে আদালতে হাজির করা হয়। ১৯.০৬.৮৯ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মেয়ের জবানবন্দী এবং মায়ের নিকট তার পত্রালাপে নমিতা দাস তাকে সাদেকসহ কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক অপহরণ এবং পরবর্তীকালে প্রাক্তন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ কর্তৃক শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের

চিত্র তুলে ধরে। মুফতি ওয়াক্কাস শুধু নমিতারাণী দাসের শ্লীলতাহানি ঘটায় নি, সে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপদাপন্ন করে তুলেছে।

নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার আবীরদিয়া গ্রামের নৃপেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত এবং তার স্ত্রী অনিমা সেনগুপ্তাকে অপহরণ করে নরসিংদীর জনৈক এডভোকেটের বাসায় এনে চারদিন আটকে রেখে অনিমা সেনগুপ্তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয় এবং তাদের দু'জনের সোয়া আট বিঘা জমি জোরপূর্বক রেজিস্ট্রি করে নিয়ে উক্ত এডভোকেটের বাসা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। অনিমা সেনগুপ্তা এ ব্যাপারে ২৭ মার্চ '৮৯ লিখিতভাবে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছেন। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার হরিদাসপুর গ্রামের হরিবোলা রঙ্গের পরিবারের সদস্যদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তার ভিটে বাড়ি দখল করা হয়েছে। শ্রী রঙ্গের পরিবারের সদস্যরা ভিখারীর মতো সাহায্যের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ময়মনসিংহের কোতোয়ালী থানার দাপুনিয়ার জনৈক হেলাল উদ্দিন দু'টি হিন্দু মেয়েকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেছে। উক্ত হেলাল উদ্দিন ঐ পরিবারের সবাইকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্যে চাপ দিচ্ছে ; অন্যথায় তাদের হত্যা করার হুমকী দিচ্ছে। উক্ত পরিবারের সদস্য রঞ্জন ও অমিত্রারাণী এ ব্যাপারে ময়মনসিংহের এস.পি'র কাছে পুরো ঘটনা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

৩ জুলাই'৮৯ রাত এগারটার দিকে বৃহত্তর রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানার ইকরচালী গ্রামের আবদুস সাত্তারের পুত্র মুকুল দলবল নিয়ে একই গ্রামের তিনকড়িলাল সাহার মেয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী জয়ন্তীরাণী সাহাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিনকড়ি সাহা থানায় মামলা করার পর ২৪ জুলাই পুলিশ জয়ন্তী সাহাকে উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে রাখে। ২৭ জুলাই জয়ন্তীকে কোর্টে হাজির করা হলে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি লোক জমায়েত করে জয়ন্তীকে মুকুলের পক্ষে জামিন দেয়ার জন্যে প্রশাসনকে চাপ প্রয়োগ করে। এরা আদালত ভবনে হামলা চালায় ও ভাঙচুর করে এবং ঢাকা দিনাজপুর সড়ক প্রায় তিন ঘন্টার মতো অবরোধ করে রাখে। থানার নির্বাহী কর্মকর্তা অতঃপর ইকরচালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের জিম্মায় পাঁচশ গজের মধ্যে জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু দেলোয়ার হোসেন প্রায় চার মাইল দূরত্বে নিজ বাড়িতে জয়ন্তীকে নিয়ে যায়। স্থানীয় প্রভাবশালীরা তিনকড়ি সাহার আইনজীবীকে কোর্টে প্রবেশ করতে দেয়নি এবং আইনজীবীকে মারধোর পর্যন্ত করেছে। তারা তিনকড়ি সাহাকে মামলা তুলে নেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে। সবশেষে জয়ন্তীর পক্ষে মামলা পরিচালনার সুযোগ না দিয়ে তাকে অপহরণকারীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

টাঙ্গাইল শহরের আদালত পাড়া থেকে ৯ জুলাই '৮৯ সন্ধ্যায় সুধীরচন্দ্র ঘোষের এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী মেয়ে মুক্তিরাণী ঘোষকে আবদুল কাইয়ুম খান নামক জনৈক আদম বেপারী অপহরণ করে নিয়েছে। অপহৃতা মুক্তিরাণীর ভাই নিবাসচন্দ্র ঘোষকে বিদেশে পাঠানোর নাম করে উক্ত কাইয়ুম খান পঁচাশি হাজার টাকা নিয়েছিল। কিন্তু সে

নিবাসচন্দ্রকে বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হলে সুধীর ঘোষ টাকা ফেরত দেয়ার জন্যে চাপ দিলে আদম বেপারী আবদুল কাইয়ুম খান মুক্তিরাণীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ভোলার কালীনাথ বাজারের শ্রীমতী শোভারাণীর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা তন্দ্রারাণীকে জাকির হোসেন ও অপর এক ব্যক্তি অপহরণের পর ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের সাহায্য চেয়েও শোভারাণী কোন সাহায্য পাননি। ২০ আগস্ট '৮৯ ঝালকাঠি সদর থানার নরেরকাঠি গ্রামের রঞ্জিতকুমার শিকদারকে অজ্ঞাত কারণে গ্রেফতার করা হয়। গ্রাম্য ডাক্তার হিসাবে তিনি জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার আকালিয়া গ্রামের জালাল শেখ ১৯৮৯ সনের প্রথম দিকে সাঙ্গপাঙ্গসহ পূর্ণচন্দ্র বর্মণের যুবতী মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালায়। জালাল শেখ ইতিপূর্বে আরো কয়েকজন হিন্দু মহিলার উপর পাশবিক নির্যাতন করেছে এবং সে মুকুন্দ বর্মণের কুড়ি বিঘা এবং প্রিয়নাথ বর্মণের পনর বিঘা জমি আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু জালাল শেখের ভয়ে কেউই থানায় এসব ঘটনা জানাতে সাহস করে না। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় হিন্দুদের একমাত্র শ্মশানটি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে। দীর্ঘ দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্মশানে শব দাহ করা হলেও একটি বিশেষ মহল ২৯ মার্চ '৮৯ শ্মশানে যাবার পথে আড়াআড়িভাবে টিনের চালা এবং পিছনের অংশে ১ এপ্রিল '৮৯ ইটের দেয়াল তুলে দিয়ে শ্মশানটি দখল করার ষড়যন্ত্র করছে। ১১ এপ্রিল '৮৯ ফুলবাড়িয়া বাজারের নারায়ণচন্দ্র দে নামে একজন ড্রাইভার মারা গেলে শ্মশানে নিয়ে যাবার পথ বন্ধ থাকায় তাকে ধানক্ষেত ও কাদাপানি মাড়িয়ে শ্মশানে নিতে হয়।

ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার কৃষ্ণপদ দত্তের অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে শুক্লারাণী দত্তকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কৃষ্ণপদ দত্ত প্রশাসনের সাহায্য চাইলে পুলিশ শুক্লারাণীকে উদ্ধার করে আইনের হেফাজতে রাখে। কিন্তু অপরদিকে আসামীকে জামিনে মুক্তি দিয়ে দেয়। অপহরণকারীরা জামিনে মুক্তি পেয়ে শুক্লার পরিবারের সদস্যদের নানা রকম ভয়ভীতি ও হুমকী দিচ্ছে।

চট্টগ্রামের মিরেসরাই থানার পশ্চিম হিংগুলী গ্রামের বেণুলাল রায়কে তার বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এলাকার আবুল খায়ের, পিতা মৃত ফকির আহমদ, ফজলুল হক দুলাল, পিতা তাজুল ইসলাম প্রমুখ নানা রকম ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে। এমনকি তারা বেণুলালকে প্রাণনাশেরও হুমকী দিচ্ছে। বেণুলাল এখন জীবনরক্ষার্থে কি করবে ? বাংলাদেশের অন্য কোন এলাকায় পালিয়ে যাবে ? কিন্তু বাংলাদেশের কোথায় নেই আবুল খায়ের, ফজলুল হক দুলালরা ? এদেশের এমন কোন জেলা কি আছে যেখানে হিন্দু সম্পত্তি দখল করা হয়নি ?

চাঁদপুরের মতলব থানার দক্ষিণ ইসলামাবাদ গ্রামের মৃত গোপালচন্দ্র দাসের এগার বছরের নাবালিকা কন্যা জ্যোৎস্নারাণী দাসকে পেপসি কোলা কোম্পানীতে চাকুরীরত কাইয়ুম নামে ত্রিশ বছরের এক যুবক অপহরণ করে নিয়ে বেআইনীভাবে বিয়ে করে। বিয়ের পর উক্ত কাইয়ুম এই নাবালিকার উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। জ্যোৎস্নারাণী

নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে চলে আসে। সে কাইয়ুমের বিরুদ্ধে ঢাকার রমনা থানায় ডায়রী করার পরেও পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করছে না।

পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার বগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনুছ মিয়া এবং ইউপি সদস্য নবী আলী মৃধা যৌথভাবে উক্ত ইউনিয়নের হিন্দুদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। এদের নির্যাতনে দেশত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে মণি ও কানাইলালের পরিবারবর্গ। উক্ত ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামের বীরেনের জায়গা জমি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত দুই ব্যক্তি বীরেনকে ধরে বেদম মারপিট করে এবং একই গ্রামের সুধীরের জায়গা জমি দখল করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে সুধীরের উপর অনুরূপ অত্যাচার চালালে সে রাতের আধারে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। বামনকাঠি গ্রামের দীনেশের কাছ থেকে এই দুর্বৃত্তদল সাদা স্ট্যাম্পে জোর করে সই নিয়েছে। তারা চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তীর জমির ধান জোর করে কেটে নিয়ে গেছে। তিনি থানায় মামলা দায়ের করলে দুর্বৃত্তরা মামলা তুলে নেয়ার জন্যে চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তীকে চাপ, ভয়ভীতি এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে। ঝালকাঠির শীতলা গ্রামের হাতেম হাওলাদার, আকবর হোসেন, মিলন, জাকির, শহীদ প্রমুখ ব্যক্তিরা উক্ত গ্রামের হিন্দু সম্পত্তি দখল করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর নানা রকম অত্যাচার নিপীড়ন চালাচ্ছে। এমনকি তারা শীতলা-খোলাতে পূজা-অর্চনায় বিঘ্ন ঘটায় এবং মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে।

যশোরের মনিরামপুর থানার টুনিরাঘরা গ্রামের বিশ্বনাথ দাসের বাড়িতে ০৩.০১.৯২ তারিখে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে লুটপাট করে এবং গৃহবধূর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় । বিশ্বনাথ দাস এই ঘটনার বিচার দাবি করলে দুর্বৃত্তদল তার প্রাণনাশের হুমকি দেয়। যশোর জেলার মহাকাল ইউনিয়নের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি কালী মন্দির ও একটি শ্মশানঘাট রয়েছে। তারা সেখানে নিয়মিত পূজা অর্চনা ও শবদেহ সৎকার করে আসছিলেন পুরুষানুক্রমে। কিন্তু ০১.০৪.৯২ তারিখে একই গ্রামের ফজলুর রহমান পিতা আব্বাসউদ্দিন শ্মশানঘাটটি ভেঙ্গে ফেলে।

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ থানার রামভদ্রপুর গ্রামের মানিক দে'র পারিবারিক পাকা শ্মশান ভাঙচুর করে এবং কয়েক হাজার টাকা মূল্যের গাছ কেটে নেয় একই গ্রামের ফজলুল হক ও আবুল কাশেম ছৈয়াল। এই গ্রামের রমেশ মণ্ডলের মেয়ে কমলাকে জনৈক ছানাউল্লাহ হাওলাদার জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে। উক্ত ছানাউল্লাহ রমেশ মণ্ডল এবং তার ভাইকে সম্পত্তির জাল দলিল প্রদর্শন করে রমেশ মণ্ডলের পৈতৃক ভিটা ছেড়ে দেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে।

১ এপ্রিল '৯২ ঢাকা শহরের ১৭, কাকরাইল রোডের স্বপনচন্দ্র ঘোষ, পিতা মৃত মহাদেবচন্দ্র ঘোষের নিউ জলখাবার মিষ্টির দোকানে ৭/৮ জন যুবক পিস্তল ছোরা দেখিয়ে দশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। তারা চাঁদা না পেয়ে কর্মচারীদের মারধোর করে এবং দোকানের ক্যাশ ভেঙ্গে বিশ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

দিনাজপুরের খানসামা থানার প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আকবর আলী শাহ গরু জবাইখানার পাশে হিন্দুদের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের জন্যে চাপ প্রয়োগ করে। ফলে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা নিজেদের বিপন্ন বোধ করছেন।

বরিশালের সদর থানার চর হোগলা গ্রামের অজিত দাসের জমি বাড়ি দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে একই গ্রামের মোহাম্মদ শাহজাহান, পিতা মৃত মতিয়ার রহমান শিকদার সাদা স্ট্যাম্পে দস্তখত জাল করে মিথ্যা বায়না প্রদর্শন করে কোন রকম টাকা পয়সা না দিয়েই অজিত দাসকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে চাপ দিচ্ছে। এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে।

মাদারীপুরের মুস্তফাপুর থানার মুস্তফাপুর গ্রামের যুধিষ্টিরচন্দ্র সাহা, পিতামৃত যদুনাথ সাহা পুরুষানুক্রমে নিজস্ব জমি চাষাবাদ করে আসছিলেন। কিন্তু ০৯.১২.৮৯ তারিখে তিনি জমিতে লাঙ্গল নিয়ে গেলে একই গ্রামের প্রভাবশালী ও লাঠিয়াল চারভাই জয়নাল, আকবর, কবির ও হায়দার মাদবর, পিতা হাকিমউদ্দিন মাদবর তাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং পুনরায় জমিতে এলে তার প্রাণনাশের হুমকি দেয়। যদুনাথ সাহা জমি হারিয়েও চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

অশোককুমার দত্ত, পিতা মৃত অমুল্য দত্ত এবং অসিতকুমার সাহা, পিতা রণজিৎ সাহা এই দুই ব্যক্তি খুলনা শহরের বড়বাজারস্থ মসল্লা পট্টিতে মাতৃভাণ্ডার নামের দোকানটি সরকার কর্তৃক ডি, সি, আর নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য করে আসছেন। ২০.১০.৯১ তারিখে অগ্নিকাণ্ডে দোকান ঘরটি পুড়ে গেলে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি উক্ত ঘরের পজেশন জবর দখলের চেষ্টা চালায় এবং তাদের দু'জনকে প্রাণনাশের হুমকি দিলে তারা থানায় ডায়রি করতে বাধ্য হন। খুলনার জেলা প্রশাসক এই ঘটনা জানতে পেরে অশোক দত্ত এবং অসিত সাহার পক্ষে কোর্টে ১০৭ ধারা জারি করেন। এর পরেও উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের দুজনকে বিভিন্ন রকম ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে এবং প্রাণনাশের হুমকিও অব্যাহত রেখেছে। আইনের আশ্রয় নেয়ার পরেও অশোক দত্ত এবং অসিত সাহা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ফরিদপুরের সদর থানার দক্ষিণচর ডুবাইল গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ বৈদ্য এবং মণীন্দ্রনাথ বৈদ্যের বাড়িতে হামলা করে মালামাল লুট করা হয়েছে এবং তাদের জমির ফসল জোর করে কেটে নিয়ে গিয়েছে। বিনা টাকায় তাদের জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়ার জন্যে চাপ দেয় এবং এক পর্যায়ে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম আঃ রহমান বেপারী, পিতা মৃত আলফু বেপারী, সাদেক আলী বেপারী, পিতা মৃত মমিন আলী বেপারী প্রমুখ। গ্রাম দক্ষিণচর ডুবাইল ০৪.০৯.৯১ তারিখে ফরিদপুরের কোতয়ালী থানার হাবেলী গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ দে, পিতা মৃত জলধর দে'র কন্যা সবিতারাণীদে ফরিদপুরের জনতা ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ছিদ্দিক মণ্ডল, সোহরাব হোসেন সিকদার, কাসেম ফকির ও আয়শা খাতুন কর্তৃক সবিতা অপহৃত হয়। অপহরণের পর থেকে সবিতার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

১১, টিপু সুলতান রোডস্থ প্রায় ৭ কাঠার বাড়িটি জনৈক বটা বসাকের নিকট হতে চার আনা পরিমাণ ক্রয় করে পুরান ঢাকার অপরাধীচক্রের অন্যতম নেতা মোহাম্মদ ইসলাম। কিন্তু জাল দলিলের মাধ্যমে সে ৭ কাঠার সমস্ত বাড়িটি দখল করে নিয়েছে এবং উক্ত জায়গায় অবৈধভাবে একটি বাণিজ্যিক ভবন (বহুতল মার্কেট) নির্মাণ করেছে।

ঢাকা মহানগরীর কোতয়ালী থানার ২৬/২, সিদ্দিক বাজারের মানিকলাল ধুপীর (পিতা মৃত ধানুলাল ধুপী) নিজস্ব সম্পত্তির অধিকাংশ একই মহল্লার সাহাবুদ্দিন, মোঃ সিরাজ, মহিউদ্দিন পারভেজ, সালাউদ্দিন, আব্দুল হালিম প্রমুখরা জোর করে নিয়ে যায়। তারা এখন মানিকলালের পুরো সম্পত্তি দখলের চক্রান্তে মানিক ধুপীকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে নানারকম ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। মানিকলাল এ ব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন সুবিচার পাচ্ছেন না।

জগন্নাথ কলেজের দু'টি ছাত্রাবাস মজুমদার হল এবং এস. আর. হল পুরান ঢাকার সন্ত্রাসী চক্র দখল করে রেখেছে। তারা ছাত্রাবাস দু'টির কাঠ, লোহা, ইট ইত্যাদি বিক্রি করে ভবনের স্থানে মাঠ করে ফেলেছে। ছাত্রাবাস দু'টি দখলকারীদের মধ্যে রয়েছে আওলাদ হোসেন, পিতাঃ জিন্নাত আলী, মোহাম্মদ ইসলাম, পিতা ঃ হাজী কালা চাঁন, মোহাম্মদ হোসেন, পিতা ঃ ঐ, মোহাম্মদ সেলিম, পিতাঃ আঃ হক মোল্লা, মোঃ মোখলেস পিতা ঃ মজিবর রহমান (পালক পিতা), মোঃ ইব্রাহিম, ফজলে এলাহী প্রমুখ। তারা ঢাকার জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে মূল দলিল গায়েব করে জাল দলিল বানিয়ে ৩৩ কাঠার এই জমি দখল করে নেয়। নোয়াখালির (বর্তমান ঠিকানা টিপু সুলতান রোড) মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাল দলিল বানাতে তাদের সহযোগিতা করেছে বলে জানা গেছে। এই সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও হয়েছে।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার পশ্চিম মুবিদপুর ইউনিয়নের আটপাড়া গ্রামের প্রফুল্লচন্দ্র পালের বাড়িতে হামলা চালায় এবং সরস্বতী প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে। একই গ্রামের সোহেল পিতা ঃ আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের পরিবার এখন অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে। ১৯৯২ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার বাহিরদিয়া মানসা ইউনিয়নের ২৯, লালচন্দ্রপুরের ১০৬/১ খতিয়ানভূক্ত ৪৬১ দাগের ৮৮ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত প্রাচীন দূর্গামণ্ডপটি একই এলাকার মোস্তাফিজুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে।

ঝালকাঠি বাহের রোডস্থ শীতলাখোলা গ্রামের হাতেম আলী হাওলাদার, আকবর হোসেন এবং তাদের সহযোগীরা একই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর চরম অত্যাচার করছে। হিন্দুদের ভিটেমাটি ছেড়ে দেয়ার জন্যে নানারকম চাপ দিচ্ছে। এমনকি তাদের পৈতৃক ভিটা ছেড়ে না দিলে হত্যা করার হুমকিও দিচ্ছে। পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের উদ্দেশে দেড়শ বছরের পুরানো দু'টি মন্দিরের একটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ প্রিক্যাডেট হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ সুজিত রায়চৌধুরীকে অবৈধ ভাবে চাকরিচ্যুত করেছে। তাকে চাকরিচ্যুত করার আগে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেও সুজিত রায় তার চাকরি ফিরে না পেয়ে এখন চরম আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। টাঙ্গাইলের দিমুখা গ্রামের ফণীন্দ্র শংকর চক্রবর্তীর নাবালিকা মেয়ে সুচিত্রা চক্রবর্তী ১১.০৪.৯২ তারিখ সকাল সাত-টায় দিমুখা শহীদ জামাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আজাহার আলীর নিকট প্রাইভেট পড়তে গেলে উক্ত বিদ্যালয়ের নাইট গার্ড আবদুল মালেক ওরফে ধলা মিয়া তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ফণীন্দ্রশংকর এ ব্যাপারে থানায় এজাহার দিলে পুলিশ ১৯.০৪.৯২ তারিখে ঢাকার তেজগাঁও এলাকা হতে আসামীসহ সুচিত্রাকে উদ্ধার করে। আদালতের আদেশে সুচিত্রা মুক্ত হয়ে তার পরিবারে ফিরে আসার পর পরই আসামী জামিনে মুক্তি পেয়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্যে ফণীন্দ্রশংকর চক্রবর্তীকে চাপ দেয় এবং সুচিত্রার সম্ভ্রম-লুণ্ঠনকারীরা তার বাবাকে হত্যা করার হুমকি প্রদান করে। একটি জমি অবৈধ দখল করাকে কেন্দ্র করে ০৮.০৬.৯২ তারিখে ফেনীর রুহিতিয়া গ্রামের মৃত কৈলাসচন্দ্র দাসের পুত্র সুরেকাচন্দ্র দাসকে একই গ্রামের মীর হোসেন পাটোয়ারী প্রচণ্ড রকম মারধোর করে এবং জমির দখল বিনা টাকায় ছেড়ে না দিলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

পঞ্চগড় জেলার অটোয়ারী থানার বর্ষালু পাড়ার সীমান্ত ফাঁড়ির হাবিলদার আসেদ হোসেন ২২.০৫.৯২ তারিখে প্রদীপকুমার রায়ের স্ত্রী তার ছোট দুই ভাইয়ের স্ত্রীসহ দুর্গামণ্ডপে মানত পূজা করে বাড়ি যাবার পথে বিনা কারণে তাদের পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে এই তিন মহিলার উপর সে নির্যাতন চালায় এবং ছেড়ে দেবার সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ইতিপূর্বে উক্ত হাবিলদার এরকম আরো ঘটনা ঘটিয়েছে।

মাগুরার শ্রীপুর থানার বরুন্ডী গ্রামের একমাত্র ধর্ম মন্দিরের কালী ও দুর্গা প্রতিমার মাথা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে রাতের আঁধারে। একই দিনে অর্থাৎ ৩০ চৈত্র ১৩৯৯ দু'টি হিন্দু বাড়িতে হানা দিয়ে নারী ও শিশুদের নির্বিচারে মারধোর করেছে দুর্বৃত্তরা। ৩২৭/৩০৭/৩৮০ ধারায় মামলা করা হলেও মামলা তুলে নেয়ার জন্যে চাপ প্রয়োগ করছে উক্ত প্রভাবশালী দুর্বৃত্তরা। এই জেলার সদর থানার ভাটপাড়া গ্রামের রাধাবিগ্রহ মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ১৩৯৮ এর ফাল্গুন মাসে তিনটি মুল্যবান পাথরের মূর্তি চুরি করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতিকারীরা। এ ব্যাপারে থানায় ডায়রি করা হলেও মূর্তি তিনটি উদ্ধার হয়নি।

নওগাঁ জেলার ধামরহাট থানার রাখরপুর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যালগিষ্ঠ সম্প্রদায় মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে চলেছে। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা থানার চর নারায়ণদিয়া গ্রামের মৃত পঞ্চানন প্রামাণিকের পুত্র শিবকুমার প্রামাণিকের জমির জাল বায়নানামা করে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে উক্ত গ্রামের জলু মুন্সী। নেত্রকোণার কেন্দুয়া থানার কুমারউড়া গ্রামের প্রফুল্ল চক্রবর্তীর চৌদ্দ

বছরের মেয়ে সীমাকে ৩০ জুন '৯২ আনুমানিক রাত দুইটায় ঘরের দরজা ভেঙ্গে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। উক্ত জেলার একই থানার কুমারউড়া গ্রামের কালিদাস নমো দাসের সদ্য বিবাহিত কন্যাকে ১৫ জুন '৯২ একই গ্রামের মফিজউদ্দিনের পুত্র সম্রাজ মিয়া জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

নোয়াখালির সেনবাগ থানার নবীপুরের কৃষ্ণ দাসের স্ত্রী স্বর্ণবালা দাসকে একই গ্রামের আবুল কাশেম চৌধুরীসহ পাঁচজন দুর্বৃত্ত রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে পরদিন (১৪ জুলাই '৯২) অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে ফেলে রেখে যায়।

রাজবাড়ীর পাংশা থানার কালুখালির মদনমোহন জিউর মন্দিরের বিগ্রহগুলো রাতের আঁধারে চুরি হয়েছে। মন্দিরের সেবায়েত ও ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করার পরেও বিগ্রহগুলো উদ্ধার করা যায়নি। নোয়াখালির সেনবাগের সোনাইমুড়ির ডাঃ হরিদাস ভৌমিক ও আশিষ ভৌমিকের বাড়িতে ৫ জুলাই '৯২ রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ককটেল রেখে এসে তাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দেয় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদের আটকে রাখা হয়।

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার রূপরায়কুড়া মরিচপুড়া ইউনিয়নের গোজাকুড়া গ্রামের বহু প্রাচীন শ্মশানঘাট স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি জবর দখল করে রেখেছে এবং শ্মশানে শবদেহ পোড়াতে বাধা দিচ্ছে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার পারুলীলতা ঋষি পাড়ায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি দল ০৮.০৬.৯২ তারিখে মাদকদ্রব্য উদ্ধারের নামে হামলা ও লুটতরাজ চালায় এবং জিতেন্দ্রনাথ ঋষির পুত্র অনিল ঋষিকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে।

বরিশাল জেলার বানরীপাড়া থানার কুন্দিহার গ্রামের জে. এল নং-৭৪ এস, এ খতিয়ান নং ২৫৪ এর ৬৪ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করার পাঁয়তারা করছে একই গ্রামের আবু হানিফ হাওলাদার গং। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি বনমালী দাসের নামে রয়েছে। বনমালী দাসের পুত্র অনন্তকুমার দাস সম্পত্তি রক্ষা এবং তার পরিবারবর্গকে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়ে ১০ মার্চ '৯৩ বরিশাল পুলিশ সুপারের কাছে দরখাস্ত করলে আবু হানিফ হাওলাদার সদলবলে অনন্তকুমার দাসের বাড়িতে এসে অশ্রাব্য ভাষায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক গালাগালি দেয় এবং মন্দিরের অবমাননা করে। এই প্রভাবশালী দুর্বৃত্ত দলটি অনন্তকুমার দাসকে হত্যার হুমকি দেয়।

ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী থানার বরিয়ান গ্রামের স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র গোপের পুত্র অজয়কুমার গোপের ৯.৬৭ শতাংশ জমি জাল দলিল করে একই এলাকার মোঃ জব্বার আলী, নুরুল ইসলাম, রমজান আলী, তারা মিয়া, আঃ জলিল, ইসমাইল হোসেন, মন্তাজ আলী, সুলতানউদ্দিন, মুকুল হোসেন, ইমান আলী, মোঃ মিয়া হোসেন, মকবুল

হোসেন প্রমুখ দখল করে নিয়েছে। এদের জাল দলিলগুলোর নম্বর ১৪১০০, ১৪১০১, ১৪১০২ এবং ১৪১০৩। রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০। অজয়কুমার গোপ এদের বিরুদ্ধে কোতয়ালী থানায় মামলা করেছেন।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের নানাইয়া গ্রামের হানিফ পালোয়ান, পিতা মৃত তাহের-উদ্দিন একই গ্রামের শরৎচন্দ্র সরকারের কাছে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। শরৎচন্দ্র তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে হানিফ সহযোগিদের নিয়ে শরৎচন্দ্রের একটি দুধের গাভী গোয়াল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হলে থানা কর্তৃপক্ষ হানিফের বাড়ি থেকে গাভীটি উদ্ধার করে এবং হানিফের সহযোগী মুনিরকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় হানিফ ক্ষিপ্ত হয়ে শরৎচন্দ্রের বড় ভাই নবকুমার সরকারের সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে পুরনো স্ট্যাম্পে একটি জাল বায়নাপত্র দলিল তৈরি করে। উক্ত বায়না নামায় নবকুমারকে দাতা দেখিয়ে হানিফ পালোয়ানকে গ্রহীতা দেখানো হয় এবং একলাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা নবকুমার সরকার গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। নবকুমার এক আবেদনে জানিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ বিষয়টিই মিথ্যা। তিনি কোন টাকা নেন নেই এবং কোন বায়নাপত্র দলিলও সম্পাদন করেননি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়দেবপুর রথখোলা মাঠের চড়কপূজা, ৩০ চৈত্র ১৩৯৯ বন্ধ করে দিয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে এই স্থানে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চড়কপুজা বন্ধ করার সময় বলেছেন, জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া পুজা করতে দেয়া হবে না।

বগুড়া সদর থানার আশেকপুর ইউনিয়নের চকজোড়া এবং সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের গন্ডগ্রামের প্রায় ষাট জন হিন্দু নাগরিকের জমি সি, এস ও এম, এম, আর, আর এবং দলিল মূলে প্রাপ্ত হওয়া রাজস্ব পরিশোধ করা সত্ত্বেও অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাদের সকলের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তারা সবাই সরকারি কর নিয়মিতভাবে প্রদান করে আসছেন। এই জেলার শেরপুর থানার হিন্দুদের শত্রু সম্পত্তি আইনের নামে অহেতুক রাজস্ব বিভাগ হয়রানি করছে। হাল সন পর্যন্ত সরকারি রাজস্ব এবং ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ থাকার পরেও অর্পিত সম্পত্তির একটি ভূয়া তালিকা তৈরি করে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের হয়রানি করা হচ্ছে। নওগাঁ জেলার আত্রাই থানার চাপড়ার বীরেন্দ্রনাথ পাল ভূপেন্দ্রনাথ পাল ও বৈদ্যনাথ পালের জমি জাল দলিল করে তা দখলের ষড়যন্ত্র করছে মোখলেসুর রহমান, মতিউর রহমান শেখ, মতিউর রহমান, সফেদ আলী। চাপড়া এলাকার উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জমি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পাল ভ্রাতৃত্রয়কে নির্যাতন ও হত্যার হুমকি দিচ্ছে। রাজশাহী জেলার বাঘা থানার পাকুড়িয়া ইউনিয়নের হিন্দু পরিবারগুলির উপর নির্যাতন চালাচ্ছে কুখ্যাত সন্ত্রাসী শাহ জামাল, পিতা মৃত রেজিতুল্লাহ মন্ডল। ইতিপূর্বে স্থানীয় প্রভাবশালীদের আশীর্বাদপুষ্ট এই সন্ত্রাসী পাকুড়িয়া গ্রামের রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, অজিতকুমার পালের স্ত্রী, শংকর পালের স্ত্রী সহ বহু হিন্দু পরিবারের

মেয়েদের ওপর হামলা চালিয়ে ইজ্জত ও সম্মানের ক্ষতি সাধন করেছে। ২৭ আগস্ট '৯২ একই গ্রামের দিলীপ কুমার সাহার স্ত্রী সরমারাণীর ওপর সে হামলা করে। সরমারাণী আত্মরক্ষার্থে চিৎকার করলে শাহ্ জামাল তাকে জাপটে ধরে এবং সম্ভ্রমহানির চেষ্টা চালায়। সরমারাণীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এলে শাহ্ জামাল পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সালিশ বসিয়েও শাহ্ জামালের কিছুই করা সম্ভব হয়নি।

কুমিল্লার বুড়িচং থানার ময়নামতী ইউনিয়নের ঘোষনগর গ্রামের তরণীমোহন, পিতা মৃত রাজকুমার দেবনাথ-কে তার বসতবাড়ি থেকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে একই গ্রামের জনৈক আবদুল আজিজ, পিতা মৃত আঃ মজিদ, ০৬ ফেব্রুয়ারী '৯৩ তারিখে ৪০/৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল নিয়ে তরণী দেবনাথের বাড়িতে প্রবেশ করে, তার পুত্র ও পুত্রবধুকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং বাড়ির উপর অবৈধভাবে একটি ঘর তোলে। পরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত ঘরটি অপসারণ করা হয়। আবদুল আজিজ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তরণীমোহন দেবনাথ ও তার পুত্রের প্রাণনাশের হুমকি এবং পারিবারিক সম্মান ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে আসছে। একই জেলার লাঙ্গলকোট থানার চিয়রাগ্রামের ময়নচন্দ্র সাহা, পিতা মৃত রায়মোহন সাহার জমি দখলের উদ্দেশ্যে মৃত জিন্নাত আলীর পুত্র আবদুল গফুর, গ্রাম চিরতা জাল দলিলের মাধ্যমে উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছে। ফেনীর পরশুরাম থানার পরশুরাম ইউনিয়নের হিমাংশুবিকাশ মজুমদার ওরফে ভক্ত মজুমদারকে ৩০ অক্টোবর '৯২ অপহরণ করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক ভক্ত মজুমদার উত্তরাধিকার সুত্রে বাউরখুমা জমিদার বাড়ির বিশাল সম্পত্তির মালিক। অপহরণের আগে তার এই সম্পত্তি দখলের জন্যে স্থানীয় প্রভাবশালী কতিপয় ব্যক্তি নানারকম কুটকৌশল ও ভয়ভীতি দেখিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অপহরণের পরদিন ভক্ত মজুমদারের পরিধেয় লুঙ্গি ও একটি স্যান্ডেল বাড়ির অদূরের রাস্তায় পাওয়া গিয়েছে। তার অপহরণের ব্যাপারে পরশুরাম থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১ তারিখ ০৩.১১.৯২।

কিশোরগঞ্জ সদর থানার ফজলুল হক গং ২৬ জুলাই'৯২ একই এলাকার শ্রী শুদ্ধোধনের কাছে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করলে তিনি তা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ফজলুল হক ওরফে কাঞ্চন অবৈধ অস্ত্রের মুখে শুদ্ধোধনকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং সাদা স্ট্যাম্পে জোর করে সই করিয়ে তাদের জমি ও বাড়ি দখল করে নিয়ে শুদ্ধোধনের পরিবারকে ২৬ জুলাই '৯২ ভারতে তাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে জানার পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার মাগুরা গ্রামের শেফালী চক্রবর্তীর পুত্র তপন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে তাকে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। তপনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগে বলা হয়েছে মজিবুল হকের ভাগিনা লিটন মিয়াকে ১২ ডিসেম্বর '৯২ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ৪/৫ জন সঙ্গীসহ তপন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় এবং পাহাড়িকা ট্রেনের নিচে ফেলে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু সে সময়

পাহাড়িকা ট্রেন না আসায় তপন ও তার সঙ্গীরা লিটনকে বেঁধে মারধোর করে এবং তার বাম হাতের আঙ্গুল ধারালো দা দিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু এলাকার সচেতন মহল দাবি করছে এই মামলাটি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তপনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। তপনের পৈতৃক সম্পত্তি যার একমাত্র উত্তরাধিকারী সে তা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে তপনকে ভয়ভীতি ও এরকম নির্যাতন করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই মামলা দায়ের করেছে।

সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার বাল্লা (ভাটপাড়া) গ্রামের বিজন ভট্টাচার্যের (পিতাঃ মৃত বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে জওয়াইদ আলী, শেখ বটু, শম্ভু মিয়া, ফারুক আহমেদ, আঃ জলিল, সিরাজউদ্দীন, মকু মিয়া প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তি চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা বিজন ভট্টাচার্যকে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। সুনামগঞ্জ জেলার বীরগাও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালেকউদ্দীন একই গ্রামের মৃত মণীন্দ্র শীলের মেয়ে পার্বতী শীলকে গভীর রাতে ঘরে প্রবেশ করে ধর্ষণ করে। সুনামগঞ্জ সদর থানায় এ ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে মামলা করার পর উক্ত চেয়ারম্যান পার্বতীরাণীকে হত্যা করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। জীবনের ভয়ে পার্বতীরাণী পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার বিশারীঘাটা গ্রামের কালিন্দ্রনাথ হালদারের পনর বছরের মেয়ে পুতুলরাণীকে ২১ মার্চ '৯২ ভোর রাতে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে কিছু সন্ত্রাসী। অপহরণকারীরা স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় অপহরণের পর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলীন্দ্রনাথ তার নাবালিকা মেয়েকে ফেরত পাওয়ার জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি অপহরণকারীদের বিচার বা শাস্তি চান না, মেয়েকে ফেরত চান।

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি থানার কালীবাড়ি বাজারের রায়মোহন ও কড়িমোহন শীলের ৪২ শতাংশ জমি আঃ বারিক সরকার, পিতা মৃত আতর আলী সরকার, গ্রাম ঃ চৈতাজানি, থানা শ্রীবরদী এবং মোঃ ইস্রাফিল ওরফে গেদা, পিতা মৃত ইছব আলী, নওয়াব আলী ও নজরুল ইসলাম এই চারজন একদল সন্ত্রাসীসহ ৬ মে '৯৩ তারিখে তাদের বাড়ি চড়াও হয়ে জোর করে সাদা স্ট্যাম্পে টিপসই করিয়ে উক্ত জমি নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। রায়মোহন ও কড়িমোহনকে উক্ত সন্ত্রাসীদল জমি দখল করে নিয়ে যাবার পরেও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। দখলকৃত ৪২ শতাংশ জমির মূল্য লক্ষাধিক টাকা।

পটুয়াখালী শহরের দামবাড়ি (সুবজবাগ) এলাকায় ধর্মীয় কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরের কাছেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে মসজিদ নির্মাণ করার ষড়যন্ত্র করছে কুখ্যাত রাজাকার স্বাধীনতা পূর্ব মুসলীম লীগ জেলা সম্পাদক সৈয়দ আবদুল খালেক। পটুয়াখালী শহরের বিশিষ্ট হিন্দু বিরাজকুমার দাসের মায়ের কাছ থেকে তাদের মন্দিরের অদূরবর্তী ২.৩৭ শতাংশ জমি সরকার জেলা সম্প্রসারণের কাজে হুকুম দখল করে। এই স্থানে সরকার বিগত ৩১/৩২ বছরেও কোন নির্মাণ কাজ না করায় উক্ত জায়গা

অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এই অব্যবহৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণের জন্যে স্থানীয় প্রশাসনের নিকট থেকে উক্ত আবদুল খালেক লীজ এনেছে। উল্লেখ্য যে, মন্দির থেকে মসজিদ নির্মাণের স্থানের দূরত্ব মাত্র পঁচিশ হাত।

পাবনা জেলার সুজানগর থানার শোলাকুড়া গ্রামের ললিতকুমার ঘোষের প্রায় ৫০/৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের জমি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ললিতকুমার ঘোষের ১০/১১ বছরের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ১৮ মে। কাজী শামসুর রহমান, আফতাবউদ্দীন, মাহতাবউদ্দীন, আজিজুল হক, আছিরউদ্দীন শেখ প্রমুখরা ললিতকুমার ঘোষের জমি বর্গা চাষ করতো। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হঠাৎ করে জমির ফসল দেয়া বন্ধ করে দেয় এবং জমি দখল করে। তারা ললিত ঘোষের বাড়ির সম্মুখে একটি মসজিদও নির্মাণ করে এবং জমিজমা ছেড়ে ললিত ঘোষকে চলে যাবার জন্যে হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে তারা ললিত ঘোষের এই নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করে এবং ললিতকুমার ঘোষকে হত্যা করার হুমকি দেয়। তিনি প্রাণভয়ে পাবনা শহরে পালিয়ে আসার পথে দুলাই বাস স্ট্যান্ডের কাছে তার সমস্ত মালামাল ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। এরপর ললিতকুমার ঘোষ ১৯৮৪ থেকে আজ পর্যন্ত প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়েও তার জমি এবং মেয়ে ফিরে পাননি।

গাইবান্ধা সদর থানার পরিবার পরিকল্পনা অফিসের সহকারী সাধনারাণী দে শহরের কালীবাড়ি রোডে পরিবার পরিজন নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু এলাকার জনৈক ডাক্তার নুরুল ইসলাম তালুকদার সাধনারাণীর বসতবাড়ি সংলগ্ন ৭৩ শতাংশ শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে জাল দলিল ক'রে দখলের ষড়যন্ত্র করে এবং সাধনারাণীকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। উক্ত নুরুল ইসলাম অবৈধভাবে দখলকৃত জমিটিতে সাধনারাণীর বাড়ির চারদিক দিয়ে দেয়াল তুলে দেয়। ফলে গৃহবন্দী অবস্থায় সাধনারাণী মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে পানির লাইন কেটে দিয়ে জীবননাশের হুমকি দেয়। সাধনারাণী এ ব্যাপারে পৌরসভা চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন। কিন্তু প্রভাবশালী মহলের প্রভাবে সাধনারাণীর আবেদন প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কঠিন হৃদয়ে কোন রকম সহানুভূতি জাগাতে পারেনি। পরবর্তীকালে ডাক্তার নুরুল ইসলাম তালুকদার সশস্ত্র দলবল নিয়ে ২০.০৬.৯৩ তারিখে সাধনারাণীর উপর হামলা করে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক এবং টি এন ও বরাবর মামলা দায়ের করলে নুরুল ইসলামসহ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট ও বানোয়াট চার্জসীট দাখিল করা হলে সাধনারাণী সাত ধারায় নিরাপত্তা মামলা দায়ের করেন থানা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। তারা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে স্বাক্ষীদের হাজির না হবার জন্যে অবৈধ প্রভাব বিস্তার, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার ও হুমকি প্রদান করে। স্থানীয় পত্রপত্রিকায় এ ব্যাপারে একাধিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পরে প্রশাসন রহস্যজনকভাবে নীরবতা পালন করছে। সাধনারাণী সবশেষে প্রধানমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রী ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট বিচার প্রার্থনা করেও কোন ফল পাননি।

পটুয়াখালী জেলা সদরের লঞ্চ ঘাট এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে স্বামী সংসার নিয়ে বসবাস করে আসছেন মিনুরাণী পোদ্দার। ২৮.০২.৯৪ তারিখে এলাকার আনিসুর রহমান সশস্ত্রদল নিয়ে কোর্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিনুরাণীর পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালায়। সন্ত্রাসীরা মিনুরাণীর বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে এবং বাড়ি জবর দখলের চেষ্টা করে। স্থানীয় জনতার চাপে সন্ত্রাসীরা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও মিনুরাণীর পরিবারকে হত্যা ও উচ্ছেদের হুমকি দিয়ে আসছে।

বরিশাল জেলা সদরের বি, এম, স্কুল রোডস্থ প্রফুল্লকুমার সাহা, পংকজ সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র হালদার ও অমিয়বালা সাহার দীর্ঘদিনের লীজকৃত সম্পত্তি জনৈক মোস্তাফিজুর রহমানকে কর্তৃপক্ষ পুনরায় লীজ দিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত চারজনের লীজকৃত সম্পত্তি কোর্টের রায়, খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের রায় থাকার পরেও এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উক্ত মোস্তাফিজুর রহমান ২১.০১.৯৪ তারিখে লীজকৃত সম্পত্তির পুকুর ভরাটসহ জবর দখলের চেষ্টা চালায় এবং লীজগ্রহীতা চার ব্যক্তিকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছে।

ফেনীর সদর থানার সিন্দুরপুর ইউনিয়নের বৈখালী গ্রামের মহেন্দ্রকুমার দাস ও হরেন্দ্রকুমার দাস একই গ্রামের মুন্সী হাবিবুর রহমান পিতা মৃত তোজাম্মেল হক-এর কাছে ৩৯ শতাংশ সম্পত্তি আমানত রাখে। কিছুদিন পরে মহেন্দ্র দাস ও হরেন্দ্র দাস উভয়েই মৃত্যুবরণ করলে তাদের পুত্র যথাক্রমে স্বপনকুমার দাস ও অনিলকুমার দাস সম্পত্তি ফেরৎ চাইলে তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয়। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ভয় দেখানো হয় এবং দেশত্যাগ করার হুমকি প্রদান করা হয়।

ঢাকার মীরপুর থানার ১২ নম্বর সেকশনের জনৈক আলহাজ্জ সুলায়মান মোল্লার দুই ছেলে হাজী সুজুত মোল্লা ও গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বিরলিয়ার গোপীবল্লভ সাহার ভাইপোকে জোরপূর্বক ঘরে আটকিয়ে জঁমি লিখে নেয়। তারা মীরপুর, সাভার ও উত্তরা এলাকার হিন্দুদের অনেক জমির জাল দলিল বানিয়ে জবর দখল করে নিয়ে নানারকম ভয়ভীতি ও হত্যার হুমকি দিয়ে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়েছে। উক্ত দুই ভাইয়ের এহেন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার জেহালা বাজারের নিতাই চন্দ্র পাল তার পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে ২৪ একর ২ শতক জমির মালিক হন। কিন্তু এলাকার আব্দুল বারীর নেতৃত্বে একদল প্রভাবশালী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী জাল দলিলের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি দখল করার চক্রান্ত করলে নিতাইচন্দ্র পাল আইনের আশ্রয় নেন। মামলায় আবদুল বারী গংদের কাগজপত্র জাল প্রমাণিত হলে তারা বিভিন্ন কূটকৌশল ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। নিতাইচন্দ্র পাল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এই থানার গোবিন্দপুর গ্রামের রাজকুমার রামেকার পৈতৃক সম্পত্তি আলমডাঙ্গা ইউনিয়নের ভূমি অফিসের তহশীলদার তাহের তার ছেলে রকিব ও অপর কয়েক ব্যক্তির নামে জাল দলিল দেখিয়ে বেশ কিছুদিন

যাবৎ উক্ত সম্পত্তি আত্মসাতের পাঁয়তারা করছে। উক্ত তহশীলদার এই সম্পত্তিকে কখনো অর্পিত, কখনো খাস, আবার কখনো পরিত্যক্ত দেখিয়ে লীজ দেয়ার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে উক্ত চক্রটি রাজকুমারকে জড়িয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করছে।

লক্ষীপুর জেলার সদর থানার দালাল বাজারস্থ রাধামাধব জিউ আখড়ার সম্মুখের যাতায়াতের রাস্তায় স্থানীয় ফিরোজ আলম পাটোয়ারী, খন্দকার মফিজুল ইসলাম, মোজাম্মেল হোসেন, মোঃ শাহজাহান সহ কতিপয় সন্ত্রাসী ঘর নির্মাণ করে মন্দিরে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে জানানোর পরেও কোন ফল হয়নি। বরং উক্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী ১৫.০১.৯৪ তারিখে মন্দিরে প্রবেশের পথটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে। ফলে এলাকার ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ধর্ম পালন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং উক্ত গোষ্ঠি মন্দিরটি দখলের ষড়যন্ত্র করছে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার ৭ নং হেডকোয়ার্টার ইউনিয়ন নির্বাচনে জনৈক রেজাউল করিম জনগণ কর্তৃক চরমভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকে এলাকার হিন্দু ভোটারদের নানারকম হুমকি দিচ্ছে। তার অভিযোগ হিন্দু ভোটারগণ তাকে ভোট দেয়নি। তাই সে দলবল নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের দেশত্যাগ করার হুমকী দিচ্ছে।

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার যদু বয়রা ইউনিয়নের বাকিদহ গোবিন্দপুর মৌজার প্রায় দেড় একর জমি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী লিয়াকত আলী সর্দার অবৈধভাবে জবর দখল করে আছে। এই জমির প্রকৃত মালিক অশোক মজুমদার যথারীতি খাজনা দেয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন সহযোগিতা পাননি। বহুবার সালিশ ডেকেছেন অশোক মজুমদার। সালিশ কাগজপত্র প্রত্যক্ষ করে অশোক মজুমদারের পক্ষেই রায় দিয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি জমির দখল ছাড়েনি। বরং সে অশোক মুজমদারের স্ত্রী গীতা মজুমদারের নামের ২২ শতাংশ জমিও দখল করে নিয়েছে।

মাদারীপুর জেলার সদর থানার পূর্ব ছিলারচর গ্রামের হরিপদ মজুমদার এবং স্কুল শিক্ষক দীনেশচন্দ্র মজুমদারসহ উক্ত গ্রামের অন্যান্য হিন্দু পরিবারগুলি একই গ্রামের বাবুল সরদার ও সেলিম ভুইয়ার নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাস বাহিনীর হাতে কার্যত জিম্মি হয়ে পড়েছে। এই সন্ত্রাসীরা কিছুদিন আগে রঘুরামপুর পাবলিক হাই স্কুলের শিক্ষক দীনেশচন্দ্র মজুমদারকে অপহরণ করে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং মুক্তিপণ দাবী করে। পরে সন্ত্রাসীদের দাবী অনুযায়ী মুক্তিপণ দিয়ে দীনেশচন্দ্র মজুমদারকে মুক্ত করে এনে ভবিষ্যতে নিরাপত্তার জন্যে স্থানীয় থানায় ঘটনাটি জানানোর পর পুলিশ বাবুল সরদার ও সেলিম ভূইয়াকে দলবলসহ গ্রেফতার করে। এই সন্ত্রাসীদল জামিনে মুক্তি পেয়ে এসে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্যে হুমকি দিচ্ছে ; অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে আসছে।

যশোরের বাঘারপারা থানার শ্রীপুর গ্রামের জনৈক মহিউদ্দিন মোল্লা কিছু ভুয়া কাগজ পত্র দ্বারা একই গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ১ একর ৩৩ শতাংশ জমি আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। মহিউদ্দিন মোল্লা ভূমি জরিপ বিভাগের কিছু অসাধু কর্মচারীদের সহযোগিতায় উক্ত জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এই ভূয়া বন্দোবস্ত বাতিল করে মন্দিরের জমি মন্দিরের নামে রেকর্ড করার জন্যে এলাকাবাসী দাবী জানাচ্ছে। এলাকাবাসীর এই দাবি উপেক্ষা করে মহিউদ্দিন মোল্লা মন্দিরের জমি দখল করার পাঁয়তারা করছে।

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার রাণীগাও ইউনিয়নের পারফুল মৌজার তেলিমারা ও হরিণমারা গ্রামে কিছু সংখ্যক হিন্দু নাগরিক বসবাস করে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান খাস জমির নামে উক্ত হিন্দুদের জমি থেকে জবরদখলমূলকভাবে মাটি কেটে, জমি দখল করে পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ ও দেশত্যাগে বাধ্য করছে।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক হারাণচন্দ্র দেবনাথ ৩১.১০.৯২ তারিখে এই কলেজে যোগদান করেন। সরকারী নিয়মানুযায়ী তিনি তিন বছর এই কলেজে থাকতে পারবেন। ০৩.১০.৯৩ তারিখে তাঁকে বরুড়ার শহীদ স্মৃতি সরকারী কলেজে বদলী করা হয়েছে। কিন্তু একই বিভাগে এস, এম, সফিউদ্দিন তেরো বছর যাবৎ ভিক্টোরিয়া কলেজে রয়েছেন। তাছাড়া শ্রী দেবনাথের স্ত্রী কুমিল্লা জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা সুপর্ণা দেবনাথ। সরকারী নিয়মে স্বামী স্ত্রী সরকারী চাকুরিজীবী হলে উভয়কে একই জায়গায় পোস্টিং পাওয়ার অগ্রাধিকার রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব ফয়জুন্নেসা হলের হিন্দু ছাত্রীদের আয়োজিত সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে হামলা করে বিদ্যাদেবীর মূর্তি ভাঙচুর করা হয় ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।

বাংলাবাজারের ১নং শিরিশদাস লেনে বিউটি বোর্ডিং অবস্থিত। এই বোর্ডিংএর মালিক প্রহ্লাদচন্দ্র সাহাকে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে নরপশুরা হত্যা করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তরুণ লেখক, কবি, শিল্পীদের সাহিত্য ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্র ছিল এই বিউটি বোর্ডিং। আজকে তাঁদের অনেকেই শিল্প সাহিত্যের জগতে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছেন। তাঁদের অনেক অমূল্য সৃষ্টি এই বিউটি বোর্ডিংএ বসে হয়েছে। কিন্তু ১০৪/এ/৭, পুলপার, জাফরাবাদ মোহাম্মদপুরের জনৈক শরীফুল ইসলাম এই ঐতিহাসিক বিউটি বোর্ডিং দখল করার চক্রান্ত করছে।

ননীগোপাল হালদার নামে ৩৫ বছরের একজন সংগীত শিল্পীকে, যিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত শিল্পী, ১১ নভেম্বর '৯৪ ঢাকার নিউ মার্কেটের পাশের নিউ সুপার মার্কেটের একটি ঘরে নিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁকে নিউ মার্কেটের ওভার ব্রিজের নিকট থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। তিনদিন পরে পুলিশ ননীগোপালের লাশ মার্কেট এলাকার মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করা হলেও হত্যাকাণ্ডের মূল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সুশীলরাম গৌড় নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারীকে ৩০ মে '৯৪ তার বাসভবন অরফ্যানেজ রোড, লালবাগ থেকে তুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। শুভ নামে স্থানীয় মাস্তান ও তার দল সুশীলরামের নিকট দশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করলে তিনি তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সুশীলরামকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুশীলরামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

কুমিল্লার যোগেন্দ্রকুমার মালী ঢাকার সাভার থানার উত্তর কাউনিয়া এলাকায় একটি জমি কিনে বাড়ি তৈরি করার প্রস্তুতি নিলে স্থানীয় মৌলবাদীরা তাকে বাড়ি নির্মাণ করতে বাধা দেয় এবং বাড়ি নির্মাণ না করে যোগেন্দ্রকুমারকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্যে চাপ প্রয়োগ করে। কুমিল্লা থেকে স্থায়ীভাবে সাভার চলে আসা যোগেন্দ্রকুমার এ ব্যাপারে আইনের সাহায্য চেয়ে ২৭ জুলাই '৯৪ সাভার থানার শরণাপন্ন হলে থানা কর্তৃপক্ষ যে সকল মৌলবাদীরা যোগেন্দ্রকুমারকে আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা নেয়নি।

কেরানীগঞ্জের হাজী আব্দুল মামুনের নেতৃত্বে একদল মৌলবাদী মার্চ '৯৩ তে স্থানীয় দুর্গামন্দিরে হামলা করে। মৌলবাদীরা দুর্গা মন্দির ভাঙচুর করে এবং মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় মন্দির ও আশেপাশের হিন্দুবাড়ি থেকে। এ ব্যাপারে কেরাণীগঞ্জ থানাকে জানালেও থানা কর্তৃপক্ষ কাউকে গ্রেফতার করেনি। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ মাভাইয়ারচর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে লুট করা হয়েছে ১৯৯৪ এর এপ্রিল মাসে। সন্ত্রাসীরা এই গ্রামের পঞ্চাশটিরও বেশি বাড়িতে হামলা করে বাড়িগুলো ধ্বংস করে দেয়।

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার পাথরখোলা চা বাগানের শ্রমিক কলোনীতে ৫ ও ৬ মে '৯৫ সন্ত্রাসীরা হামলা করে একশ'র বেশি বাড়ি ধ্বংস করে। সন্ত্রাসীদের দু'দিনের এই হামলায় দু'জন নিহত ও এক হাজার হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই জেলার বড়লেখা থানার পূর্ব শাহবাজপুরের নিরামকুশকান্তি দে (টুটুন)কে মুসলিম মৌলবাদীরা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছে ১৮ জুন '৯৪। কুলাউরা থানার মাগুরা গ্রামের তপনকুমারকে পুলিশ দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রেফতার করে তাদের হেফাজতে রেখেছে। এই গ্রামের মুজিবুল হক তপনকুমারের সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে ১২ ডিসেম্বর '৯৪ থানায় একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। কিন্তু তপনকুমার নানা রকম অত্যাচার সহ্য করেও তার পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে চলে না যাওয়ায় মজিবুল হক তাকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই হত্যা মামলা দায়ের করে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিরীহ তপনকুমারকে এই মামলার প্রধান আসামী করে।

নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার লেটাবর গ্রামের রজনীচন্দ্র দাসের পুত্র প্রবোধচন্দ্র দাসের বাড়িতে ২৫ জুলাই '৯৫ একই এলাকার ইলিয়াস মিয়ার নেতৃত্বে একটি সন্ত্রাসী

দল হামলা করে মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এবং প্রবোধচন্দ্রকে তার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে শাসিয়ে যায়।

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার তাজপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারী শ্যামসুন্দর নাথের বাড়িতে হামলা করা হয়। আমজাদ হোসেন সর্দারের পুত্র আবদুল বারেক সর্দারের নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসী এই হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় মিঃ নাথের দুইপুত্র ও এক নাতি আহত হয়। তারা হামলার সময় এই বাড়ির সমস্ত মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ১৬ এপ্রিল '৯৫ শ্রী নাথ এ ব্যাপারে থানায় ডায়রি করে ফিরলে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সন্ত্রাসীরা তাকে আক্রমণ করে। তারা শ্যামসুন্দর নাথকে ডায়রি করার অপরাধে (?) মারধোর করে এবং তার ঘড়ি, চশমা, কলম ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে তার বাড়িতে যখন হামলা হয় শ্রী নাথ তখন বাড়িতে ছিলেন না। এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে তিনি জেলা প্রশাসককে জানালে, মুন্সিগঞ্জের ডি.সি. সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি।

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার জার্মিতা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় মুখ-চেনা কিছু সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। এই সন্ত্রাসীরা উদ্দেশ্যমুলকভাবে হিন্দু বাড়িগুলিতে চুরি, ডাকাতি ও নারী নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা শহরের সূত্রাপুর থানার হাটখোলা রোডের মন্দির ও মন্দির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সমূহ আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিদেশী কোম্পানীকে লীজ দেয়া হয়েছে। সূত্রাপুর থানার ২৪ কালীচরণ সাহা রোডের একটি অর্পিত সম্পত্তি লীজের জন্যে ঐ বাড়িতে বসবাসরত দেবেন্দ্রচন্দ্র সরকার ও সাধনচন্দ্র সরকার আবেদন করে লীজ প্রাপ্তির যাবতীয় নিয়ম-কানুন পূরণ করার পরেও তাদের লীজ না দিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত ঐ এলাকার ২৪, কালীচরণ সাহা রোডের বাড়িটি জনৈক মুসলিম নাগরিককে লীজ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের শরণাপন্ন হওয়ার পরেও দেবেন্দ্র সরকার ও সাধনা সরকার কোন ফল পাননি।

গাজীপুর জেলার কাজি আজিমউদ্দিন কলেজ রোড থেকে ০২.০৬.৯৪ তারিখে উর্মি দাস নামের একটি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে উর্মি দাসের অভিভাবক স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করে মামলা দায়ের করার পরেও পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধারের ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপহরণকারীরা উর্মি দাসকে দীর্ঘদিন অজ্ঞাত স্থানে রেখে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছে।

নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার করটখিল গ্রামের চিন্তাহরণ নাথের দখলী সম্পত্তি একই থানার পশ্চিম শ্রীনগর গ্রামের নূর মোহাম্মদ ও নূর হোসেনসহ একদল সন্ত্রাসী জাল দলিলের মাধ্যমে জবর দখলের চেষ্টা করছে। তারা জোর করে জমিতে চাষাবাদ ও ঘর নির্মাণের চেষ্টা করে। চিন্তাহরণ নাথ তাদের বাধা দিতে গেলে তাকে হত্যা করার হুমকি

দেয়া হয়েছে। আত্মরক্ষার্থে চিন্তাহরণ নাথ নিজের জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ফেনী জেলার পরশুরাম থানার বাউরসুমা গ্রামের জ্যোতিলাল ভৌমিকের পৈতৃক সম্পত্তি একই গ্রামের আবুল হোসেন মজুমদার জাল দলিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। উক্ত আবুল হোসেন মজুমদার সন্ত্রাসী দল নিয়ে জ্যোতিলাল ভৌমিককে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে হুমকি দিয়ে আসছে।

রাজবাড়ির জেলার সদর থানার মাতুয়াপট্টী মন্দিরের সম্পত্তি স্থানীয় কুচক্রী মহল জাল দলিল ও ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় মন্দিরের জায়গা ফেরত পাবার জন্যে প্রশাসন ও স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের সাহায্য প্রার্থনা করেও সাহায্য পাননি। স্থানীয় কুচক্রী এবং অর্থলোভী কিছু সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীর যোগসাজসে মন্দিরের সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বেদখল হয়েছে।

ঠাকুরগাও জেলার সদর থানার হরিহরপুর গ্রামের শ্রীশ্রী কালী মাতার মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি স্থানীয় জনৈক নজরুল ইসলাম ১৮ আগস্ট '৯৪ অন্যায়ভাবে রাজশাহীর পোষ্টমাস্টার জেনারেলকে লিখে দিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার জেলার আলমডাঙ্গা থানার জিহালা বাজারের নিতাইচাঁদ পালের বসতবাড়ি মিথ্যা ও বানোয়াট কাগজপত্রের মাধ্যমে আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি। নিতাইচন্দ্র পালকে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি চক্রান্ত করে নিতাই পালের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দায়ের করেছে।

ঢাকা শহরের এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী পাল বংশের কয়েকজন দানবীর ব্যক্তি প্রতিদিন শহরের শতাধিক গরীব লোককে বিনাপয়সায় একবেলা খাবার পরিবেশনের মহৎ উদ্দেশ্যে 'মদনমোহন পাল অন্নছত্র ট্রাস্ট এস্টেট' নামে ১৯২৪ সালে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পাল বংশের কিছু সম্পত্তি দান করে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। এই ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে, বিভিন্ন সম্পত্তি হতে আদায়কৃত ভাড়া এই ট্রাস্টের একমাত্র আয়ের উৎস। ১২২, নবাবপুর রোডের সম্পত্তি উক্ত ট্রাস্টের নিজস্ব সম্পত্তি। ফৌজদারী আদালতে সাজাপ্রাপ্ত সমাজবিরোধী উক্ত এলাকার আবদুস সামাদ মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করে এই সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র করছে।

মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানার চন্দনপুর গ্রামের রামপদ ঋষির বাড়িতে ৮ ফেব্রুয়ারী'৯৪ সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা হামলা করে রামপদ ঋষির সদ্য বিদেশ ফেরত ছোট ভাই লক্ষণের লক্ষাধিক টাকার মালামাল ও নগদ টাকা নিয়ে যায়। এর আগে উক্ত দুর্বৃত্তরা রামপদ ঋষির স্ত্রী রানীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে মাঠের মধ্যে ফেলে উপর্যুপরি কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করে। এই সন্ত্রাসী দল ঐ গ্রামের রত্নেশ্বর ঋষির কন্যা রুপিকে একাধিক বার অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করে ছেড়ে দেয়। রুপি এক পর্যায়ে গর্ভবতী হয়ে

পড়লে গরীব রত্নেশ্বরের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারায় অবিবাহিত রুপি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এই সন্তান স্থানীয় চেয়ারম্যানের আত্মীয় এবং মিসির আলী সরদারের পুত্র হাবিবুর রহমান হাবির ঔরসজাত বলে রুপি দাবী করার পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। রুপিকে যারা অপহরণ করে ধর্ষণ করেছে হাবি তাদের নেতা। অবিবাহিত রুপি এখন তিনবছর বয়সের পুত্র সাদ্দামকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে বিচার প্রার্থনা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সন্ত্রাসী দল গ্রামের অন্যান্য ঋষি পরিবারের উপরও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

নড়াইল পৌর এলাকার মহিষখোলা গ্রামের এবং নড়াইল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রামুরানী দেবনাথকে ০৩ ফেব্রুয়ারী'৯৪ সন্ধ্যার দিকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার পরেও রামু দেবনাথের বাবা খোকন দেবনাথ থানায় মামলা করার পরেও পুলিশের কোন সাহায্য পাননি। অপহৃতা রামুরানী দেবনাথকে দীর্ঘ আট মাসেও উদ্ধার করতে না পেরে খোকন দেবনাথ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন।

চট্টগ্রামের চকবাজার এলাকা থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শুভাশীষ দত্ত ভানুকে ০৮ ডিসেম্বর'৯৫ রাতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা দশ লাখ টাকা মুক্তি পণ দাবি করে শুভাশীষ দত্তের পরিবারের কাছে টেলিফোনে সংবাদ পাঠালে তার বড় ভাই পরেরদিন বাদী হয়ে কোতোয়ালী থানায় মামলা করলে পুলিশ তিন দিন পরে শুভাশীষ দত্ত ভানুকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরের মিনি সুপার মার্কেটের স্বর্ণব্যবসায়ী পরিতোষ ধর রাঙ্গুনিয়া থানার বেতাগীতে নিজ বাড়িতে গেলে ০৩.১০.৯৫ মঙ্গলবার রাতে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচলাখ টাকা দাবি করে অপহরণকারীরা সংবাদ পাঠিয়েছে। অপহৃত পরিতোষ ধরের পরিবার সশস্ত্র অপহরণকারীদের হুমকির কারণে থানায় কোন মামলা কিংবা অভিযোগ করতে পারেনি।

ভোলা জেলার দৌলতখান থানার উত্তর সৈয়দপুর গ্রামের বিষ্ণুপদ সেনের পুত্র সঞ্জীব সেনকে (১৫) চরপাড়া ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আবদুর রহমানের নেতৃত্বে মৌলবাদী গোষ্ঠী অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই গোষ্ঠী সঞ্জীব সেনকে আটক রেখে প্রলোভন দেখিয়ে, ফুসলিয়ে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা বিষ্ণুপদ সেনকে জীবননাশের হুমকিসহ ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। শ্রী সেনের পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় মামলা করা হলেও প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি ফরিদপুর জেলা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছে উক্ত স্কুলের শিক্ষক মোঃ খবিরউদ্দিন। ফলে স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভোলা জেলার লালমোহন থানার পশ্চিমচর উমেদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা আবু তৈয়ব জাঙ্গালিয়া মৌজার ২৮০২

দাগের জমির উপর অবস্থিত শ্মশান কেটে পুকুর তৈরি করেছে। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে অবহিত করার পরেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার বেড়কোট গ্রামের মেজবাহউদ্দিন এবং আড়ৈত গ্রামের আবদুল মজিদ ব্যাপারী সদলবলে উক্ত এলাকার নরেশচন্দ্র নাগ, বিশ্বনাথ ভৌমিক সহ হিন্দুদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে জোরপূর্বক টাকা আদায় করছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা না দিলে উক্ত সন্ত্রাসী চক্র হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার ভাউরপাড়া গ্রামের দিলীপচন্দ্র আইচকে ২৪.০৭.৯৫ তারিখে হাজীগঞ্জ বাজারের মোঃ মুসলিম মিয়াসহ কতিপয় সন্ত্রাসী অপহরণ করে হত্যার চেষ্টা করে। উল্লেখ্য যে, এই সন্ত্রাসীচক্র ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৫ দিলীপচন্দ্র আইচের ছোট ভাই মানিক আইচকে অপহরণ করে হত্যা করেছে বলে স্থানীয় সচেতন মহল মনে করে। এই সন্ত্রাসীচক্র ইতিপূর্বে দিলীপ আইচের সম্পত্তি দখল করার উদ্দেশ্যে নানারকম ভয়ভীতি দেখিয়ে ব্যর্থ হয়ে দিলীপ আইচকে হত্যা করে তার সম্পত্তি দখল করার চক্রান্ত করছে।

বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার গিলাতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রী চিত্তরঞ্জন পালকে ২৪ জুলাই '৯৫ উক্ত এলাকার আব্দুল বারী, সাজ্জাত হোসেন, গাজী মাজেদ, শেখ জালাল, গাজী মাহবুব হোসেনসহ একদল সন্ত্রাসী বেদম প্রহার করার ফলে শ্রী চিত্তরঞ্জন পাল মৃত্যু বরণ করেন।

মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শরীফ শাহজাহান ও দারোগা মফিজুল ইসলাম কাজলের নেতৃত্বে একদল পুলিশ উক্ত থানার বাবুখালী ইউনিয়নের কুলিপাড়া গ্রামের ডাক্তার দুলালচন্দ্র বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে ডাক্তার দুলালচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র দীপককুমার বিশ্বাস, স্ত্রী সবিতারাণী বিশ্বাস, দীপকের স্ত্রী বেলারাণী বিশ্বাস ও ডাক্তার দুলালচন্দ্রের ছোট মেয়ের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। পুলিশী নির্যাতনের খবর পেয়ে ডাক্তার বিশ্বাস বাড়িতে এসে দেখতে পান তার পুত্র দীপক বিশ্বাসকে একটি গাছে ঝুলিয়ে পুলিশ প্রহার করছে। তিনি ঝুলন্ত অবস্থা থেকে ছেলেকে নামানোর জন্যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানালে পুলিশ ডাক্তার দুলালচন্দ্র বিশ্বাসকে পেটাতে পেটাতে পুত্রসহ থানায় নিয়ে যায়। পরদিন দশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে ডাক্তার দুলালচন্দ্র বিশ্বাসকে জামিন দিলেও দিলীপকে আদালতে চালান করে দেয়। উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদপুর থানার এই ও.সি. এভাবে মিথ্যা গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখিয়ে এলাকার হিন্দুদের গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে আর্থিক ফায়দা লুটছে।

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানার চুকাই বাড়ি গ্রামের শোভারাণীর সমুদয় সম্পত্তি জাল দলিল বানিয়ে একই জেলার বক্সীগঞ্জ থানার মাইচানীরচর গ্রামের মৃত সুমার আলী আখন্দের পুত্র শাহ আলম জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। শোভারাণী আইনের আশ্রয় নেয়ার উদ্যোগ নিলে শাহ আলম সদলবলে শোভারাণীকে হত্যা করার হুমকি প্রদান

করে। ঢাকা জেলার ডেমরা থানার রামলক্ষণ মন্দির ও শংকর আশ্রমের যাতায়াতের রাস্তা একই এলাকার আফাজউদ্দিন প্রমুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে এই দু'টি মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠান ও অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাবলী বন্ধ রয়েছে। ঢাকা শহরের সূত্রাপুর থানার শশীমোহন বসাক লেনের কানা বাবুল, দুলাল, খোকন, ইকবাল, ইউনুস, নুরু ও কামাল নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে উক্ত এলাকার হিন্দুদের উপর যথেচ্ছ নির্যাতন করে আসছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার শ্রী চিত্তরঞ্জন দত্ত তার বোনের মেয়েদের নিয়ে ৩.১০.৯৫ তারিখ রাত আটটায় স্থানীয় পূজা মণ্ডপে গেলে একই এলাকার নান্নু নামের জনৈক সন্ত্রাসী তাদের উপর আক্রমণ করে চিত্ত বাবুর ভাগ্নীদের স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

দিলীপচন্দ্র পাল, গ্রাম হুগলী, থানা কলমাকান্দা, জেলা নেত্রকোণা-এর বাড়িতে একই ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সজল ফকির ১০.০৩.৯৫ তারিখে সদলবলে হামলা করে তার ছোট বোন হেলেনরাণী পালকে ধর্ষণ করে। হেলেনরাণীর স্বামী শিবচন্দ্র পাল ও ভাই দিলীপচন্দ্র পাল বাদী হয়ে স্থানীয় থানায় এই ব্যাপারে মামলা করলে উক্ত সজল ফকির তাদের দু'জনকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। অন্যথায় তাদের হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে সজল ফকির গং। বরিশাল শহরের কালীসিচন্দ্র রোডের মনোরঞ্জন মজুমদারের পুত্র বিজন মজুমদারের নিকট তথাকথিত সর্বহারা পার্টির রফিক গংরা সাড়ে পাঁচলক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীদের এই দাবী পূরণ না করলে তারা বিজন মজুমদারকে হত্যা করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। বরিশাল সদরের আলেকান্দা মৌজার জে. এল. নং ৫০ দাগের দেবোত্তর সম্পত্তি একই এলাকার মৃত নাসিরউদ্দিন ভূইয়ার পুত্র কবিরউদ্দিন ভূইয়া দখল করে নিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের শত বছরের পুরান এই মন্দিরের জায়গা জোরপূর্বক দখল করে নেয়ার পেছনে বরিশাল পৌরসভার কিছু অসৎ কর্মচারী/কর্মকর্তার ভূমিকা রয়েছে বলে জানা গেছে। সাতক্ষীরা জেলার কাটারোয়া থানার তুলসীডাঙ্গা গ্রামের কালী মন্দিরের ৪.৮৮ একর দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা। এই দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করার পর দখলকারীরা উক্ত জায়গায় একটি গাছ বিক্রি করেছে এক লাখ টাকা। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর পরেও প্রশাসন কোন ভূমিকা না রাখায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। সিলেটের ত্রিপুরা চা বাগানের রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি রাজীব আলী নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি বিক্রি করার চক্রান্ত করছে।

ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানার কাহিয়া গ্রামের নরেশচন্দ্র মণ্ডলের নাবালিকা কন্যা রাণী মণ্ডলকে একই এলাকার মোঃ বাবুল ও তার সঙ্গীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। নরেশ মণ্ডল এ ব্যাপারে বোরহানউদ্দিন থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নাম্বার ৬৪/১৯৯৫।

২৩ নবাবপুর রোডের এই জমিটির প্রকৃত মালিক শ্রী রমেন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু প্রাক্তন মেয়র আবুল হাসনাতের শ্বশুর মোঃ জহির যোল্লা জাল দলিলের মাধ্যমে দীর্ঘকাল

জমিটি ধরে দখল করে রেখেছে। এই সম্পত্তি ছাড়াও সে ঢাকা শহরের আরো বেশী কিছু জমি এভাবে দখল করে রেখেছে। উল্লেখ্য যে ১৯৯০ এবং ১৯৯২ সালে ঢাকা শহরের হিন্দুদের উপর যে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয় প্রাক্তন মেয়র আবুল হাসনাত ছিল তার প্রধান হোতা। তিনি ঢাকার ওয়ার্ড কমিশনারদের ডেকে গোপনে মিটিং করে হিন্দুদের উপর হামলা করার নির্দেশ প্রদান করেন। আবুল হাসনাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলা করা হয় এবং এরপর লালবাগসহ ঢাকার অন্যান্য স্থানে হামলা চালানো হয়। এডভোকেট কফিলউদ্দিন নামে পুরান ঢাকার গোয়ালনগরস্থ জনৈক হিন্দু বিধবা মহিলাকে ধর্মান্তরিত করার সব রকম অপচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে উক্ত হিন্দু মহিলার জমি বাড়ি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে। মহিলার মৃত্যুর পর তার পালক পুত্রকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারাগারে ঢুকিয়ে রেখেছে। ৩২ গোয়ালনগরের জনৈক মাইনু মিয়ার পুত্র মোহন, কামাল, নুরুল ইসলাম প্রমুখদের হাতে গোয়ালনগর এলাকার হিন্দু ব্যবসায়ীরা জিম্মি হয়ে আছে– হুমকি, ব্লাকমেইলিং ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে তারা নিয়মিত চাঁদা আদায় করে আসছে। এই সন্ত্রাসীচক্রের নির্যাতনে এলাকার অনেক হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

পুরান ঢাকার ৪৫ নরেন্দ্রনাথ বসাক লেনের মোহাম্মদ সেকান্দর নামে জোড়া খুনের সাজাপ্রাপ্ত আসামী ৪৮ নবেন্দ্রনাথ বসাক লেনের মন্দিরের ৩ কাঠা জমি দখল করে রেখেছে। সে নিজে এবং ভাড়াটে গুন্ডাদের দ্বারা এলাকার ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দিয়ে আসছে। এছাড়া উক্ত এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিধু সাহা তার বিরুদ্ধে সত্যসাক্ষী দেয়ায় উক্ত সেকান্দর বিধু সাহাকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে এবং বিধু সাহার বসত বাড়িটি দখল করার পাঁয়তারা করছে।

নড়াইল জিলার লোহাগড়া থানার লেজাগড়া গ্রামের ১৬ বছর বয়স্ক শুক্লারাণী শিকদারকে ১৯ সেপ্টেম্বর ’৯৭ গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় একই থানার জাতরা গ্রামের আশরাফুল আলম এসিড নিক্ষেপ করে শুক্লার মুখমণ্ডল ও হাত ঝলসে দিয়েছে।

ময়মনসিংহ শহরের অধিকাংশ হিন্দু সম্পত্তি তখন শত্রু সম্পত্তির তালিকাভূক্ত। কতিপয় স্বার্থান্বেণী মহল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এ সব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভূক্ত করেছে। এ শহরের জুট বেলিং কর্পোরেশনের নিজস্ব সম্পত্তি এডভোকেট কানু বিশ্বাস, শামীম আহমেদ, সুখেন্দু রায়, নুরুল ইসলাম সহ মোট ২২ জনের কাছে ১৯৮৮ সালে বিক্রি করে দেয়া হয়। প্রায় একশ বছর আগে জুট বেলিং কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ জায়গাটি জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের থেকে ক্রয় করেছিল। শত বছর আগে যেহেতু এ জায়গার মালিক ছিলেন হিন্দু, সেই সূত্র ধরেই ময়মনসিংহ ভূমি অফিসের এক শ্রেণীর অসৎ কর্মচারীর যোগসাজসে এই সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হয়।

রতিরঞ্জন নাগ ময়মনসিংহের ধলা বাজারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এই বাজার থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে বাবুপুর গ্রামে তার পৈতৃক বাড়ি ছিল। এই গ্রামে শুধু তারাই

একঘর হিন্দু বসবাস করতেন। রতিরঞ্জনের পিতার জীবদ্দশায় ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের বাড়িতে চুরি ডাকাতি করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সম্প্রতি রতিরঞ্জনের কিশোরী নাবালিকা কন্যাকে ধলা এলাকার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির আত্মীয় ফুসলিয়ে নিয়ে যায়। মেয়ে উদ্ধারের জন্য সালিশ ডেকে সুফল না পেয়ে রতিরঞ্জন নাগ আইনের আশ্রয় নেয়। ময়মনসিংহে এই মামলা চলাকালীন প্রভাবশালী মহলটি রতিরঞ্জনের মামলাটি ঢাকায় ট্রান্সফার করে, যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রতিরঞ্জনের পক্ষে মামলার হাজিরা দিতে ঢাকা যাতায়াত সম্ভব না হয়। মেয়েকে হারিয়ে রতিরঞ্জন নাগ অসহায় ও শোকার্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। এখন মামলা ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

১৯৯৪ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার সিংগা ইউনিয়নে জরীপ সম্পন্ন এবং জরীপকৃত ভূমি সম্পত্তি রেকর্ডভূক্ত করা হয়। জমি রেকর্ডভুক্ত হওয়ার পর পর সিংগা ইউনিয়নে কোন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু জরীপ সংক্রান্ত সব কাজ শেষ হওয়ার তিন বছর পরে ১০ আগস্ট ১৯৯৭ কাশিয়ানী থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিংগা ইউনিয়নের ৫৩০টি পরিবারের নামে তাদের জমি শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির আওতায় বলে নোটিশ প্রেরণ করে। গোপালগঞ্জ সদর থানার খেলনা, টলপুর গ্রামের প্রায় সম্পূর্ণটাই শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির তালিকাভূক্ত দেখানো হয়েছে।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার আঁধারমানিক গ্রামের বাসিন্দারা স্থানীয় সন্ত্রাসীদের কারণে এবারে (১৯৯৬) দূর্গাপূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারেনি। কুখ্যাত রাজাকার ফজলুল কাদের চৌধুরীর পুত্র সাংসদ গিয়াসউদ্দীন কাদের চৌধুরীর ভাড়াটে লোক বলে পরিচিত স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসী পূজা অনুষ্ঠানের উদ্দোক্তাদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করলে উদ্দোক্তারা সন্ত্রাসীদের সে দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে পূজা অনুষ্ঠান বাদ দিতে বাধ্য হয়।

দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পিসির বাড়িতে বেড়াতে এসে সিনেমা দেখে ফেরার পথে পাঁচ সন্ত্রাসীর হাতে অপহৃত হয়ে উপযুপরি ধর্ষণের শিকার হয়েছে ফটিকছড়ি থানার খিরাম গ্রামের এক স্কুল ছাত্রী। ২২ অক্টোবর '৯৬ চট্টগ্রামের হাটহাজারীর রূপালী সিনেমা হলে সিনেমা দেখে পিসির দেবরের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে সেকান্দরের নেতৃত্বে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে পর্যায়ক্রমে পাঁচজনে তাকে ধর্ষণ করে।

চট্টগ্রাম শহরের বিশিষ্ট স্বর্ণব্যবসায়ী মিলনকান্তি ধর ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে হাটহাজারী থানার এনায়েতপুর থেকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহৃত হন। অপহরণের কুড়ি ঘন্টা পর অপহরণকারীদের ফাঁকি দিয়ে তিনি রাউজানের গভীর অরণ্য থেকে পালিয়ে আসেন। মিলনকান্তি ধর পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তাঁর অপহরণ ঘটনায় এদেশের হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছেন। কারণ সারা দেশে হিন্দু ব্যবসায়ীদের অপহরণ, নির্যাতন, নিপীড়ন করে তাদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। জাতীয় দৈনিক সমূহ এ বিষয়ে

প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। দৈনিক 'আজকের কাগজ' ১১ আগস্ট '৯৬ এ বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা উদাহরণ মাত্র।

অপহরণের দীর্ঘ ১৬ মাস পরেও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরের কেন্দুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুমিতারাণী বসাক মুক্তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি কলেজের অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বসাকের কন্যা সুমিতারাণী বসাক মুক্তাকে (১৪) ১৯৯৫ সালের ৪ জুন একই এলাকার বেলাল হোসেন অপহরণ করে নিয়েছিল।

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার নেওড়া গ্রামের ৩০ শতাংশ মানুষ হিন্দু। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনতির কারণে এ বছর (১৯৯৬) তারা দুর্গাপূজা আয়োজন করার সাহস পায়নি। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার চন্ডিদানদি গ্রামের শ্মশানের জায়গা গত ২০-০৩-১৯৯৬ তারিখে একই এলাকার সরোয়ার মোল্লা ও সামসুদ্দিন অবৈধভাবে ঘর তুলে দখল করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের সাহায্য প্রার্থনা করেও এলাকার হিন্দুরা ব্যর্থ হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ঝুমা ঘোষকে (১৭) কলেজে যাওয়ার পথে শহরের ময়াগোবিন্দ গ্রামের মোহাম্মদ আলীসহ কতিপয় সন্ত্রাসী ২৯-০৮-১৯৯৬ তারিখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

সাতক্ষীরা জেলার পাইকগাছা থানার পুটিমারি গ্রামের দরিদ্র বিমল মণ্ডলের স্ত্রী শেফালী মণ্ডলকে (২৫) ২১ আগস্ট '৯৬ একই থানার শ্রীরামপুর গ্রামের সোলেমান ফকিরের ছেলে কুদ্দুস ফকির জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। কুদ্দুস ফকির প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং শেফালী ও তার স্বামীকে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাবার জন্যে হুমকি দিচ্ছে।

শরিয়তপুর জেলার বাহের কুলিয়া গ্রামের বৃদ্ধা অলোকরাণী কুন্ডুর (স্বামী মৃত নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু) সম্পত্তি একই এলাকার ডাঃ সেকান্দার দীর্ঘদিন যাবৎ দখল করে রেখেছে। অসহায় অলোকরাণীকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্যে ডাঃ সেকান্দরের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে আসছে। মাদারীপুরের রাজৈর থানার বাজিতপুর ইউনিয়নের রাজকুমার মজুমদারের মার নামের ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়টি টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ১৯৭৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি জাতীয়করণ করলেও খালেদা জিয়া সরকার এটা বিক্রি করে দেয়। এলাকাবাসীরা খালেদা সরকারের বিক্রি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে।

লক্ষীপুর জেলার সদর থানার কালির চরের শ্রী কান্তিলাল মজুমদারের সম্পত্তি প্রতারণা করে উক্ত এলাকার মোঃ নুরুদ্দিন প্রমুখরা দখল করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে কান্তি লাল আদালতে মামলা করলে দখলকারীরা শ্রী মজুমদারের প্রাণনাশের হুমকী দিচ্ছে।

মৌলভিবাজার জেলার রাজনগর থানার কাশীপুর চা বাগান ১৯৬৫ থেকে সরকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সরকারের পক্ষে মহি আহম্মদ চৌধুরী এই চা বাগানটি অস্থায়ীভাবে দেখা শোনা করছে। ২৩.০৩.১৯৯৬ তারিখে সরকার এক পত্রে জানিয়েছে এ বাগানের স্বত্বাধিকারী দেবেশচন্দ্র পুরকায়স্থ। মহি আহম্মদ চৌধুরী চা বাগানটি অবৈধভাবে দখল করার পাঁয়তারা করছে এবং ইতোমধ্যে সে অননুমোদিতভাবে বাগানের সম্পত্তি থেকে প্রায় ত্রিশলাখ টাকা আত্মসাৎ অথবা ক্ষতি সাধন করেছে।

দৈনিক সংবাদের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার ভক্তের কন্যা সুপ্রিয়া ভক্তকে সোহেল বাশার নামে জনৈক যুবক অপহরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ঢাকা শহরের ৯ চামেলী বাগস্থ প্রফুল্ল ভক্তের বাড়িতে গিয়ে সোহেল প্রভৃতিরা নানা রকম হুমকি দিচ্ছে। শ্রী ভক্তের পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ব্যাপারে মতিঝিল থানায় জি.ডি এন্ট্রি করা হয়েছে। জি.ডি নম্বর ১৫১২, তারিখ ১৭.০৮.১৯৯৬।

০৯.০৮.১৯৯৬ ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার নওগাঁ গ্রামের মিনতিরাণী (২২) একই থানার কালিয়া ইউনিয়নের কন্ডল বালিয়া গ্রামে স্বামীর অসুস্থতার খবর শুনে পিত্রালয় থেকে যাবার পথে ফুলপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রাত ১১টায় ইঞ্জিল মিয়া, আবদুস সাত্তার ও রফিকুল ইসলাম নামে তিনজন পুলিশ কনস্টেবল তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং মিনতিরাণীর উপর রাতভর পাশবিক নির্যাতন চালায়।

মাগুরা জেলার সদর থানার আঠারোখোদা ইউনিয়নের নলদা গ্রামের নৃপেন্দ্রনাথ সম্প্রতি তার প্রতিবেশী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ি ও সম্পত্তি কিনে নেয়। সম্পত্তি বিক্রি করে চিত্তরঞ্জন ভারতে চলে যায়। তার চলে যাবার পর থেকেই পাশের গ্রামের বদিউল আলম ও তুকী মুন্সি জাল দলিল করে উক্ত সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে নৃপেন্দ্রনাথ আদালতে মামলা করলে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীরের সহায়তায় নৃপেন্দ্রনাথ সহ এলাকার হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে। নৃপেন্দ্রনাথ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ফরিদপুরের রাজবাড়ি আদর্শ মহিলা কলেজের ছাত্রী শিল্পীরাণী সরকারকে ৭ আগস্ট '৯৬ তারিখে অপহরণ করেছে পাংশা থানার দামুকদিয়া গ্রামের মোঃ গফুর মন্ডলের পুত্র সাইদুল ইসলাম। শিল্পীরাণীর বাবা তারাপদ সরকার বাদী হয়ে অপহরণের মামলা দায়ের করার পরেও শিল্পীরাণীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বরিশাল শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজসেবক মিহির দত্তের সম্পত্তি এলাকার প্রভাবশালী মহল দখল করার চেষ্টা করছে। সন্ত্রাসীরা মিহির দত্তকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হুমকি দিচ্ছে। জয়পুরহাট জেলার ভানাইকুশলিয়ার হোসেন মুরমুরের স্ত্রী শ্রীমতী রুমিলা মাণ্ডীর কন্যা পুতুল মুরমুরের ১.৯০ (এক একর নব্বই শতাংশ) জমি একই এলাকার নিজামউদ্দিন, আবু সুফিয়ান, কোরবান আলী, আবদুস সোবহান প্রমুখরা জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার কাশিমপুর মৌজার ১৭০ দাগের ১.২১ শতাংশ জমি শ্রী শ্রী সিদ্ধেশরী কালী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী মহল অবৈধভাবে দখল করার পাঁয়তারা করছে। ফলে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-অর্চনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। রাজধানীর ডেমরা থানার মাতুয়াইলের কোনাপাড়াস্থ আদর্শবাদ গ্রামের মনোরঞ্জন সরকারের স্বপ্না নামের ৮ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করেছে এলাকার সন্ত্রাসীরা। শিশু বোনকে ধর্ষণ করার প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসীরা স্বপ্নার বড়ভাই গোপালকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৪.১১.১৯৯৬ তারিখে। ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার কলাকোপা গ্রামের হিন্দুদের উপর স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহলে অত্যাচার, নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছে। ফলে এ এলাকার হিন্দুরা নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ঢাকা শহরের সবুজবাগ থানার রাজারবাগের জয়দেবচন্দ্র দাসের ১৩ বছরের মেয়ে নয়নতারা দাস ১৩.০১.১৯৯৭ তারিখ রাত ১০টায় তার কাকার বাসা থেকে টেলিভিশন দেখে নিজেদের বাসায় ফেরার পথে একই এলাকার আনোয়ার হোসেন নয়নতারা দাসকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। মহানগরীর ডেমরা থানার ৪৪৩, মুরাদপুর মাদ্রাসা রোডের রাজেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডলের পুত্র শ্যামচাঁদ মণ্ডল। ২০.০১.১৯৯৭ তারিখে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী কামাল হোসেনের পুত্র মোঃ লিটন এবং তার ৮/১০ জন সহযোগী শ্যামচাঁদ মণ্ডলের গ্যারেজে হামলা করে ক্যাশবাক্সে রক্ষিত সমস্ত টাকা লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে শ্যামচাঁদ বিচার প্রার্থনা করলে লিটন তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

বাগেরহাট জেলার রায়েন্দা কৃষি ব্যাংক শাখার পরিদর্শক অধীরকুমার সাহা ৩০.১১.১৯৯৫ তারিখে ফকিরহাট রাজস্ব অফিস থেকে ফেরার পথে জনৈক রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে তার স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এই স্ট্যাম্প দেখিয়ে পরবর্তীকালে ২০.০১.১৯৯৭ তারিখে ফলতিতায় অবস্থিত অধীর বাবুর চিংড়ি ঘের থেকে লক্ষাধিক টাকার গলদা চিংড়ি জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায় এবং সন্ত্রাসীরা অধীরবাবুকে চিংড়ি ঘেরসহ সমস্ত সম্পত্তি ফেলে রেখে ভারতে চলে যাবার হুমকি দিয়ে আসছে। অধীরকুমার সাহার পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। একই জেলার সদর বাজারস্থ ঘোষপট্টির মৃত মনোরঞ্জন ঘোষের পুত্র রামপ্রসাদ ঘোষের সাতক্ষীরার 'ঘোষ ডেয়ারি' বাবু মোল্লা জোরপূর্বক রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। রামপ্রসাদ সহায়-সম্বলহীন হয়ে বর্তমানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরের শ্রী শ্রী গোবিন্দ জিউ ও শিব বিগ্রহ মন্দিরের জমি আবদুল হকের পুত্র খন্দকার আবু জাফর মোহম্মদ ছালেহ অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। সে মন্দিরের গাছপালা কেটে ফেলেছে এবং ঘর ভাঙচুর করেছে। এ ব্যাপারে উলিপুর থানা প্রশাসনকে অবহিত করার পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। একই থানার জোনাইদাঙ্গা গ্রামের ডাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকারের জমি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিবেশী ফজলউদ্দীন এবং ধরম শ্রেণী ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের জগদীশের জমি জাল দলিল

তৈরী করে দখল করা হয়েছে, প্রশাসনকে জানানোর পরেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে উলিপুরে হিন্দু জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার চন্দ্রনাথ চতুস্পাটি টোলের জমি মন্দির সড়কের মোঃ ইসমাইলের পুত্র মোঃ আমিরুজ্জামান অবৈধভাবে দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। চট্টগ্রাম শহরের ১৮৮/এ, জুবলি রোডের মহুয়া এন্টারপ্রাইজের মালিক অমিতবরণ মিত্র রপ্তানীমুখী শিল্প গড়ার জন্য ১৮,১৫,০০০/- টাকা ইনভেস্ট করে পাচলাইশ থানার ১৯ কাতালগঞ্জের পেয়ার মোহাম্মদের পুত্র হাসান আলীর সঙ্গে। সে অমিতবরণের সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং অমিতবরণকে হত্যাকরার হুমকি দিচ্ছে।

ঢাকার টঙ্গী থানাধীন ফকির মার্কেটের কুমিল্লা মেডিক্যাল হাউসের মালিক অনিলকুমার সরকার এবং তার স্ত্রী সীমারাণী সরকার। এই দোকানটি দখল করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ২৫.০৭.১৯৯৫ তারিখে আবিচপুর গ্রামের আঃ সাত্তার গাজীর গাজীর পুত্র আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সীমারাণীকে অপহরণ করে ৪৫ দিন আটক রাখে, পাশবিক নির্যাতন চালায়। ৫০ হাজার টাকার বিনিময় ০৯.০৯.৯৫ তারিখে অনিল সরকার স্ত্রীকে মুক্ত করে আনার পর গত ০১.০১.৯৬ তারিখে উক্ত সন্ত্রাসী চক্রের সদস্য মতিউর রহমান দাবি করে সীমা মুসলমান হয়েছে এবং সে তার স্ত্রী। সীমারাণীকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তারা অনিল সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে, চাঁদা দাবি করছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার অদূরে ভাটিকান্দি ময়ুরাপুর গ্রামের একদল সন্ত্রাসী বিষমরাণীকে (২৪) ধর্ষণ করার পর হত্যা করে। এ গ্রামের দীনবন্ধু সিংহ রায়ের মেয়ে বিষয়রাণী ১৭.০১.৯৬ তারিখ রাতে প্রকৃতির ডাকে ঘরের বাইরে গেলে ওৎ পেতে থাকা একদল সন্ত্রাসী উঠানের খড়ের গাদার পাশে নিয়ে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণ শেষে গলায় মাফলার পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে।

কুমিল্লার কতোয়ালী থানাধীন রাজরাজেশ্বরী কালীবাড়ির মালিক প্রয়াত জ্যোতিভূষণ দত্ত মৃত্যুকালে শহরস্থ তার ০১.১৫ একর জমির উপর অবস্থিত দোকান, মন্দির ও জমির আয় জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় হবে বলে উইল করে যান। উইল মতে জ্যোতিভূষণ ট্রাস্ট কমিটি গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টের আয় থেকে রাজরাজেশ্বরী কালীবাড়ি, কাত্যায়নী কালীবাড়ি, আর কে অনাথ আশ্রম, চান্দীমুড়া কালীবাড়ি, বৌদ্ধ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি একটি স্বার্থান্বেষী মহল উক্ত উইলের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে এবং এ সম্পত্তি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জেলার মুরাদনগর থানার ত্রিশগ্রামের মৃত সুখলাল দেবের পুত্রদের সম্পত্তি ১৯৬২ সালে কুমিল্লা-সিলেট এবং কোম্পানীগঞ্জ- নবীনগর সড়ক নির্মাণের সময় সরকার হুকুম দখল করে। সড়ক নির্মাণের পর বর্তমানে অনেক জমি অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এ সব জমি সুখলাল দেবের পুত্রদের লীজ না দিয়ে অন্যদের লীজ দেয়া হচ্ছে।

ফেণীর ফুলগাজী থানার গোপালচন্দ্র ধরের বাবা ও ভাইকে ২১.০৬.১৯৮৭ সালে সন্ত্রাসীরা মারাত্মকভাবে জখম করে এবং তার বোনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে নিম্ন আদালতের রাখে সন্ত্রাসীরা সাজাপ্রাপ্ত হয় এবং হাইকোর্টে আপিল করে। বর্তমানে হাইকোর্টের এই মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত সন্ত্রাসীরা গোপালচন্দ্র ধরকে বাধা দিচ্ছে এবং তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার সোনাইমুড়ি মৌজার ৫৫ খতিয়ানের হাল এস আর ৫৭ খতিয়ানের ১২ একর ৮১ শতাংশ জমি কুঞ্জমোহন সাহার পুত্র কিরণময় সাহার পরিবারের ২৫ জন মালিক। প্রায় ৫ একর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য সরকার হুকুম দখল করে। সোনাইমুড়ি পুলিশ ইনভেষ্টিগেশন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বর্তমানে বাকি জমিও হুকুম দখল করা হয়েছে। সব জমি হারিয়ে কিরণময় সাহার পরিবারটি দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। একই থানার সিরাজউদ্দিনপুরের ১২ গোপালপুর ইউনিয়নের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমটি (গোপালপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম) ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানটির সিংহভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত হয়। বর্তমানে একই এলাকার মোঃ ইদ্রিশ মিয়া, পিতা মৃতঃ হাজী আবিদ মিয়া এ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের জমি দখল করার উদ্দেশ্যে আশ্রমের সম্পাদক ডাঃ সতীন্দ্রনাথকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে এবং নানা রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানার ভূনবীরেরশাসন গ্রামের শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জিউর মন্দির ১৪.১৯ একর দেবোত্তর সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিন যাবৎ অনিলচন্দ্র পাল এই দেবোত্তর সম্পত্তির সেবা কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু দিন আগে একই এলাকার বশির আহম্মদ প্রমুখ এই দেবোত্তর সম্পত্তির ধান কেটে নিয়ে যায় এবং বর্তমানে মন্দিরে সেবা কার্যে বাধা দিচ্ছে, সেবায়েতকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার বাকিলা গ্রামের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মণীন্দ্র সরকারকে সম্প্রতি দুষ্কৃতিকারীরা হত্যা করেছে। তাঁর সম্পত্তি দখলের হীন উদ্দেশ্যে মণীন্দ্র সরকারের বাড়িতে দুষ্কৃতিকারীরা হামলা করে এবং তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। বর্তমানে ডাঃ সরকারের পরিবারের অন্যান্য জীবিত সদস্যদের নানা রকম ভয়ভীতি ও হুমকি দেয়া হচ্ছে। তারা হুমকির মুখে অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে। একই জেলার ফরিদগঞ্জ থানার পাইকপাড়া আষ্টা গ্রামের উপেন্দ্রকুমার মজুমদারের ২৬০ আষ্টা মৌজার ৬৭৪, ৬৮৭, ৬৮৩, ৬৮৯, ৬৭৫, ৬৯৭ দাগের সম্পত্তির উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ২১.০৮.১৯৯৪ তারিখে জনৈক আবদুল মান্নান প্রভৃতিরা উক্ত সম্পত্তির গাছপালা কেটে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে আবেদন করার পরেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

লক্ষীপুর জেলার রামপুর থানার হায়দারগঞ্জের শ্রী চিত্তরঞ্জন মজুমদারকে সন্ত্রাসীরা হত্যার হুমকি দিচ্ছে। তার বাগানের নারকেল, সুপারিসহ অন্যান্য ফল মূল পেড়ে নিচ্ছে এবং তাকে দেশত্যাগ করার হুমকি দিচ্ছে। অন্যথায় চিত্তরঞ্জনকে সপরিবারের হত্যা করে

ফেলবো বলে শাসিয়ে যাচ্ছে। এ জেলার উত্তর মাগুরী ঘনশ্যামপুরের (দত্তপাড়া) বাসিন্দা হারান চন্দ্র দে, পিতা মৃত দেবেন্দ্রকুমার দে আদালতের মাধ্যমে তার জমির ডিগ্রী পাওয়া সত্ত্বেও একই এলাকার মোঃ শামসুল হক, পিতা আবদুল আজিজ গং জমির দখল নিতে দিচ্ছে না। বরং এ সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

পাবনার সাথিয়া থানার আতাইকুলা হরিবাড়ি মন্দিরটির সম্পত্তি অবৈধ ভাবে দখলের জন্যে মোঃ সগিরউদ্দিন, মোস্তফা, হেলাল, নজরুল ইসলাম সর্বপিতা মৃত ফকির মাহমুদ, গ্রামঃ সড়াভাঙ্গী, দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কক্সবাজারের মহেশখালী কুতুবদিয়া নির্বাচনী এলাকার প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতা ইসহাক মিয়া হোয়ানক গ্রামের বিধুভূষণ ঘোষের জমি দখল করার জন্যে বিধুভূষণকে হুমকি দিচ্ছে। ২৪.০৭.১৯৯৫ তারিখে ইসহাক মিয়ার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা বিধুভূষণের বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও নারী ধর্ষণ করে। ০৩.০২.১৯৯৬ তারিখে জমির দখল নেয়ার জন্যে পুনরায় ইসহাক মিয়ার নেতৃত্বে বিধুভূষণের বাড়িতে হামলা করা হয়। এ ব্যাপারে জি আর ১৭/৯৬ ইং মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ইসহাক মিয়ার সন্ত্রাসী বাহিনীর হুমকির মুখে এলাকার হিন্দুরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার রাজবিরাট একটি ঐতিহাসিক তীর্থস্থান। স্মরণাতীতকাল থেকেই এখানে শ্রী শ্রী মদনমোহন জিউ বিগ্রহের পূজা অর্চনা হয়ে আসছে। এই দেবোত্তর সম্পত্তিতে দুইটি পুকুর রয়েছে। তাছাড়া এ সম্পত্তিতে হাট ও মেলা বসে, যা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে মন্দিরের সেবা কর্মে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থানার ফুলবাড়িরর মৃত ধনীরাম ঘোষের পুত্র নরেশচন্দ্র ঘোষের উপর দীর্ঘদিন থেকে খন্দকার ইসমাইল হোসেন প্রমুখ সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালাচ্ছে। সম্প্রতি পরেশচন্দ্রকে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বলেছে, অন্যথায় তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। নরসিংদী জেলার বৌয়াকুব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী স্বপ্নাকে (৯) উক্ত এলাকার মিয়াপাড়ার মনিরুল ইসলাম (২৫) অপহরণ করেছে। স্বপ্নার বাবা হরিপদ বাদী হয়ে থানায় মামলা করার পরেও স্বপ্নাকে উদ্ধার করা যায় নি।

কিশোরগঞ্জে কালীপূজার দিনে এক দুঃখজনক ঘটনায় বিপ্লব নামে একটি যুবক মারা যায়। পরবর্তীতে বিপ্লবের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একদল সন্ত্রাসী হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলা করে। যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার গদখালী কালীমন্দির সংলগ্ন শ্মশানটি স্বার্থান্বেষী মহল বেহাত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার বাঘবেড় গ্রামের হিন্দু নাগরিকদের উপর এলাকার কালীনগর গ্রামের হাজী মোফাজ্জল

হকের পুত্র লুৎফর রহমান প্রভৃতিদের অত্যাচারে হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ সন্ত্রাসী চক্র পার্শ্ববর্তী গ্রামের হিন্দুদের উপরও অনুরূপ নির্যাতন করছে। এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপারকে অবহিত করা সত্ত্বেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

ফেণীর রেজুমিয়া বাজার থেকে বিমলচন্দ্র রায়কে নিজামউদ্দিনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা ২৭ অক্টোবর ১৯৯৭ দুপুরে অপহরণ করে নিয়ে যায়। একটি ফার্নিচারের দোকানে বিমলচন্দ্র রায়কে নিয়ে গিয়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে হাত, পা, ছিদ্র করে দেয় এবং ইট, রড দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। বিমলের বাড়ি ফেণীর শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে। সন্ত্রাসীরা তার বাবার কাছে একলাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় বৃদ্ধ নিকুঞ্জকে সন্ত্রাসীরা মারধর করে। বিমল এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে সন্ত্রাসীরা বিমল রায়কে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঢাকা শহরের নারিন্দা এলাকার শ্রীলক্ষী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক প্রয়াত নিতাইচন্দ্র দে। ৭৯ হৃষিকেশ দাস রোডের এই মিষ্টির দোকানটি সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা আজ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায়ও সন্ত্রাসীরা নিয়মিত চাঁদা দাবি করছে।

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানার শুভাঢ্যা গ্রামের মৃত নরেন্দ্র কুমার সাহার কন্যা মায়ারানী সাহার ভোগ দখল করা জমি অবৈধভাবে দখল করার জন্য স্থানীয় মমিন আলী, পিতা মৃত একাব্বর আলী, দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রশাসনের একটি স্বার্থান্বেষী মহলের চেষ্টায় এই মহল ভি.পি. ১৪২/৭৮ নং কেসে বিগত ১৯৭৮ সালে লীজ গ্রহণ করে। অবৈধ লীজের বিরুদ্ধে মামলায় উক্ত স্বার্থান্বেষী মহল হেরে যায়। বর্তমানে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মায়ারানী সাহার বাড়ীর প্রবেশ পথে বাধা সৃষ্টি করে নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে । এই থানার বিল কাঠুরিয়া গ্রামের মৃত লক্ষীন্দর মিস্ত্রীর পুত্র পরশুরাম মণ্ডল চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কুমলি ভিটা গ্রামের মোঃ আঃ সামাদের পুত্র মোঃ আশকর আলী দীর্ঘদিন ধরে উক্ত পরশুরাম মণ্ডলের মালিকানাধীন কেরানীগঞ্জ থানার ৫ শুভাঢ্যা মৌজাস্থ ৫১ শতাংশ জমি জোর পূর্বক দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি মোঃ আশকর আলী ও তার সাঙ্গপাঙ্গ পরশুরাম মণ্ডলকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। একই থানার শুভাঢ্যা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার শ্যামচাঁদ মণ্ডলের সম্পত্তি জনৈক আনিসুর রহমান মৃধা ও তাঁর সহযোগীরা জবর দখলের চেষ্টা করছে । দেবকীনন্দন কেজরীওয়াল, দোয়েল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ৬৯ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা ১০০০ তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ঢাকা-সাভার রাস্তার ব্যাংক টাউনের কাছে কর্নপাড়া ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে খালের উত্তর পাড় সংলগ্ন কিছু জমির উপর তাঁর একটি গার্মেন্টস কারখানা নির্মাণাধীন। সম্প্রতি সাভার থানার সহকারী ভূমি কমিশনার মামলা দায়ের করে তাঁকে বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করেছে। এই থানার পূর্ব আগানগরের হরিনাথ মালো উক্ত এলাকার মোঃ জাফর, মোঃ আলমগীর, মোঃ আজাহার, মোঃ কাজী মোজাম্মেল, মোঃ হাবু, মোঃ

অপুদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা কেরানীগঞ্জ থানার জিঞ্জিরা মৌজাস্থ ৬৫০ ও ৬৫১ দাগের বসতবাড়ী থেকে নিরীহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু জেলেদের নির্যাতন-নিপীড়ন করে দেশত্যাগে বাধ্য করছে। জেলার নবাবগঞ্জ থানার কাশিমপুর মৌজাধীন ১৭০ দাগের ১.২১ শতাংশ জমি শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী মহল অবৈধ লীজের বাহানা তুলে দখল করে নিয়েছে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা অর্চনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। মহানগরের উত্তরা থানাধীন কুমুদখোলা গ্রামের প্রেমদাসী নামের এক বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে মিয়াজউদ্দীন, সুরুজ মিয়া, বাবুল মিয়া, পিতা-ইব্রাহিম, মৈনারটেক জেলে পাড়া এক সুগভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গত ১৫-১১-৯৬ এবং ১৬-১১-৯৬ তারিখে প্রায় দু'শতাধিক সশস্ত্র মাস্তান নিয়ে শশীমোহন দাস (সাধু)-এর বাড়িসহ ৮/১০টি হিন্দুবাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটতরাজ করে। তারা প্রেমদাসী, শশীমোহন দাস, সুশীলারানী দাস, বাসনারানী দাস, গৌরদাসীসহ অনেককে হত্যার হুমকি দেয়। মিয়াজউদ্দীন জনৈকা আসিরুন্নেসাকে দিয়ে শশীমোহন দাস কর্তৃক পবিত্র কুরআন অবমাননার অভিযোগ আনে। এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে উত্তরা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে বৈষম্যমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

টাঙ্গাইল জেলার ফুলবাড়ি গ্রামের পরেশচন্দ্র ঘোষ, পিতা মৃত ধনীরাম ঘোষ, স্থানীয় সংঘবদ্ধ জমি জালিয়াতি চক্রের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। একই গ্রামের খন্দকার পরিবার পরেশচন্দ্রের বাড়িঘর অবৈধভাবে দখলের জন্যে তাকে প্রাণনাশের হুমকিসহ তার পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। খন্দকারচক্র মন্দিরের মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছে এবং ঘোষ পারিবারিক মন্দির চত্বরে জোরপূর্বক বসবাস করছে। স্থানীয় প্রশাসনে বিষয়টি অবহিত করা সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে তারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অপহরণের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে পুলিশ স্কুল ছাত্রী সুমারানী চ্যাটার্জীকে (১৪) উদ্ধার এবং আসামীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার বাটরা গ্রামের বাসুদেব চ্যাটার্জীর মেয়ে সুমারানী চ্যাটাজী। ৪.৩.৯৭ তারিখে পার্শ্ববর্তী কোকাদাইর গ্রামের হাজী ছিয়ানউদ্দিনের ছেলে আব্দুস ছালাম সুমাকে অপহরণ করে।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র বণিক, পিতা মৃত বিপিনচন্দ্র বণিক, ৯ যাদব লাহিড়ী লেন, মেছুয়া বাজার, কোতয়ালী ময়মনসিংহ শহরে নিজ ক্রয়কৃত বাড়িতে বহুবৎসর যাবৎ সম্প্রীতির সাঙ্গে বসবাস করে আসছে। সম্প্রতি জনেক মোঃ মজিবুর রহমান, পিতা মৃত মোঃ আব্দুল মজিদ, ৯৫/এ ব্রাহ্মপল্লী, থানা কোতয়ালী, জেলা ময়মনসিংহ – উক্ত ভোগ দখলীয় সম্পত্তি, বাসাবাড়ি ও দোকানের মালিক বলে দাবি করছে। এ ব্যাপারে ময়মনসিংহ কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে, মামলা নং ২০/৯৭। মামলা দায়ের করার কারণে মজিবর রহমান এবং তাঁর পুত্র মোঃ জুয়েল ধীরেন্দ্রচন্দ্র বণিকের পরিবারকে মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার সদর থানার ৪ পরানগঞ্জ ইউনিয়নে অবস্থিত শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং শ্মশান এর জমি অবৈধভাবে জবর দখলের চেষ্টা চলছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান আবদুল জলিল ইতিমধ্যে শ্মশানের ওপর অবস্থিত মন্দির আংশিক ভেঙে ফেলেছে এবং শবদাহ কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। এ ব্যাপারে অত্র এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করা সত্ত্বেও কোন অগ্রগতি হয়নি। ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী থানার আদমজী রেলের মোড়ে বিশ্বনাথ রায়ের পুত্র হরিলাল রায় দীর্ঘদিন ধরে লীজ গ্রহণ করে উক্ত এলাকায় বসবাস করে আসছে। সম্প্রতি তার লীজ বাতিল করে আহম্মদ নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত জমি লীজ দেওয়া হয়েছে। ফলে উক্ত হরিলাল রায় উদ্বাস্তু হবার আশংকায় চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ সদর থানার দেওভোগ পালপাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চলছে। মোঃ হিনু, পিতা মুনসুর মিয়া, লিটন, আকবর, সেলিম, গফুর প্রমুখের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে এবং নানাবিধ ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। তাদের ভয়ে মহিলারা ঘরের বাইরে বেরুতে পারছে না। সোনারগাঁও থানার মহাতীর্থ বারদীর শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে একটি স্বার্থন্বেষীমহল দীর্ঘদিন যাবৎ দেশ-বিদেশ থেকে আগত অগণিত ভক্তবৃন্দকে প্রতারিত করে আশ্রমের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে আসছে। বজলুল হক, জহিরুল হক, ছাইদুল হক, তাজুল হক, গ্রাম মিশ্রীপাড়া, নূরউদ্দিন সরকার, জাহাঙ্গীর সরকার, সোবহান, ইলিয়াস প্রভৃতিরা এই প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। এরা প্রতিদিন আশ্রমের অভ্যন্তরে গিয়ে ভোগ দেবার নাম করে সমবেত ভক্তদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করে আসছে। ২২.১.৯৭ তারিখ রাতে রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়ার আনন্দময়ী কালীমন্দিরে একদল দুষ্কৃতিকারী ও সমাজ-বিরোধী মন্দিরে রক্ষিত কষ্টিপাথরের মূর্তি ও স্বর্ণালংকার লুট করে, থানায় মামলা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনও গৃহীত হয়নি।

ফেনী পৌর এলাকার সুলতানপুর গ্রামের মৃত বৃন্দাবন লস্করের পুত্র চন্দ্রকুমার লস্কর উক্ত এলাকার মৃত চাঁন মিয়ার পুত্র (মালিক মেসার্স আমিন উদ্দিন বিড়ি ফ্যাক্টরী) আমিন উল্যাহ-র নির্যাতন নিপীড়নের শিকার। উক্ত আমিন উল্যাহ জাল দলিল করে চন্দ্রকুমার লস্করের পরিবারকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার রাজারচর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর চরম নির্যাতন-নিপীড়ন চলছে। উক্ত এলাকায় কুখ্যাত সন্ত্রাসী ফৌজদারী মামলায় দীর্ঘ মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোঃ তফেল হোসেন ওরফে তোফায়েল আহম্মেদ ওরফে এছাহাক মোল্লা, পিতা মৃত উকিলউদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীদল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, ভূ-সম্পত্তি দখল, হিন্দু নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠনের মতো অপকর্ম করছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করা হলেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার বদরপাশা ইউনিয়নের চর মোস্তফাপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন ধরে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসীর নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার। সন্ত্রাসীরা ১৭.৯.৯৬

তারিখে উক্ত গ্রামের মণীন্দ্রমোহন সন্ন্যাসীর বিধবা স্ত্রী সুনীতিরানী সন্নাসী ওরফে স্বর্ণলতাকে হত্যা করে। থানায় মামলা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা বর্তমানে পিতৃমাতৃহীন দুই ভাই রমণীমোহন ও নিতাইচাঁদকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে ।

ঠাকুরগাঁও সদর থানাধীন গড়েয়া ইউনিয়নের লস্করা গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পিতা মৃত শ্রীমন্তলাল চৌধুরীর বাসভবনে রক্ষিত শ্রী শ্রী বিষ্ণুমূর্তি স্থানীয় প্রশাসন যাদুঘরে জমা দিতে বলায় স্থানীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়ভাবে নাককাটি দেবতা হিসেবে পরিচিত উক্ত মূর্তি ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাসভবনে থাকে এবং বৈশাখ মাসে টুকুলি নামক পুকুরপাড়ে স্থাপনপূর্বক পূজা করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি স্থানীয় প্রশাসনের একটি কুচক্রী মহল উক্ত মূর্তি যাদুঘরে স্থানন্তরের নির্দেশ দিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। এ ব্যাপারে ওই এলাকার জনগণ দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

পিরোজপুর সদর থানায় শিকদার মল্লিক ইউনিয়নের জুজুখোলা গ্রামের মৃত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পুত্র সন্তোষকুমার মাঝিকে পৈতৃক ভিটা থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। জনৈক সেলিম নামের একজন সন্ত্রাসী সন্তোষকে উচ্ছেদের জন্য নানা ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই জেলার পাড়েরহাট সম্মিলিত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনুরূপা ভৌমিক দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার পদে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে। স্বার্থান্বেষী মহল তাঁকে দায়িত্ব পালনে বাধা দিচ্ছে। যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে বিঅ/৩০৮/১২২১ নং স্মারকে ১৩.০৫.৯৬ তারিখের এবং ৫.১০.৯৬ তারিখের বিঅ/৩০৮/৩৪৭৩ (৯) নং স্মারকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলেও তা কার্যকরী হচ্ছে না।

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার ঢেউয়াপাড়া গ্রামে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের কাছে অবস্থিত সুবিশাল 'রায়মুকুট দীঘি' বেআইনী ফেরবী কবলা সৃষ্টির মাধ্যমে সামান্য দামে আত্মসাৎ করার জন্যে একটি স্বার্থান্বেষীমহল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই দীঘির মালিকরা সবাই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রায় ৫০ বছর আগে এ দীঘির মালিকদের গঠিত এবং সরকার নিবন্ধিত নদ ঢেউয়াপাড়া ফিশারী কোম্পানী আমূল সংস্কার ও উন্নয়ন সম্পন্ন করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মৎস্য চাষ করে আসছে। দীঘির পাড়ে দেবালয় শ্মশান মন্দির ও শ্মশান খোলা অবস্থিত স্বার্থান্বেষী মহলের বেআইনী ফেরবী কবলার বিরুদ্ধে কোম্পানী চট্টগ্রাম আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা দায়ের করেছে। বিজ্ঞ আদালত স্থিতাবস্থার আদেশ দিলেও বিবাদীগণ অন্যান্য দুষ্কৃতকারীর সহায়তায় সম্পত্তি জবর দখল করছে। তারা দীঘির পাড়ে পাকা ও কাঁচা ঘর নির্মাণ করে ধর্মীয় কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, শ্মশান খোলার পবিত্রতা নষ্টসহ জবর দখলের পাঁয়তারা করছে। এলাকায় সংখ্যালঘু জনগণ ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবন যাপন করছে। এই জেলার সীতাকুণ্ড থানার সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ চতুষ্পাটি টোল-এর জমি মন্দির সড়কের জনৈক মৃত মোঃ ইসমাইল-এর পুত্র মোঃ আমিরুজ্জামান অবৈধভাবে দখলের জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই

জমি স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর কালে আমিরুজ্জামান প্রভৃতিরা একাধিকবার দখলের অপচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার রাজবিরাট একটি ঐতিহাসিক তীর্থস্থান, স্মরণাতীতকাল থেকেই এখানে শ্রীশ্রী মদনমোহন জিউ বিগ্রহের পূজা-অর্চনা হয়ে আসছে। এই দেবোত্তর সম্পত্তিতে দুইটি পুকুর আছে। এছাড়া এই সম্পত্তিতে হাট ও মেলা বসে, যা সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে মন্দিরের সেবা কর্মে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার নয়ারচর, বকচর ও কলাড়িয়া গ্রামের শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার একটি সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী চক্রের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। একই এলাকার সমাজ-বিরোধী মহিউদ্দিনের ছেলে জলিলউদ্দিন, ওয়াজউদ্দিন ও খলিল এই সন্ত্রাসী চক্রের মূল নায়ক। স্বাধীনতার পর থেকেই তারা বিভিণ্নভাবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। এদের অত্যাচারে নয়াচর গ্রামের সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, সতীশচন্দ্র কবিরাজ, হারাধন কবিরাজ ও সন্তোষচন্দ্র কবিরাজ ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। গত ৫.৩.৯৭ তারিখে সন্ত্রাসীরা শশাংককুমার বিশ্বাসের বাড়ীতে ঢুকে পরিকল্পিতভাবে ডাকাতি করে। ঝিনাইদহ সদর থানার পোড়াহাটি গ্রামের অপহৃত গৌরকুমার সরকার (৫৫), তার স্ত্রী মঞ্জুরাণী (৪০) এবং দু'মেয়ে মিঠু রাণী (১৩) ও টিটু রাণীকে (১১) অপহরণের দেড় মাস পরও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। নিখোঁজ গৌর কুমারের মা ও ভাইদের আশংকা গোটা পরিবারটিকেই হয়তো হত্যা করা হয়েছে। গৌর কুমার সরকার ও তার পরিবার ২৮ মে '৯৭ নিখোঁজ হয়। ঘটনার দিন রাত থেকেই গৌর কুমারের বাড়িটি ওই গ্রামেরই সাদেক আলী, ফজল করিম ও তাদের দলবল দখল করে নেয়। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সিলেটের সীমান্তবর্তী কোম্পানীগঞ্জ থানার রনিখাই গ্রামে ভৈরবীবালা শুক্ল বৈদ্য নামীয় এক কিশোরীকে রাতের আঁধারে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার পর বিয়ে করে অতঃপর নৃশংসভাবে বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১১ মে থানার নতুন জীবনপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের চার ছেলে ইসলাম উদ্দিন, রইছ উদ্দিন, লুৎফর রহমান, বকুল এবং একই গ্রামের আবদুল জববার রনিখাই গ্রামের কালাচাঁদ শুক্ল বৈদ্যের কিশোরী মেয়ে ভৈরবীকে অপহরণ করে। পরবর্তীতে তার নাম আমেনা বেগম রাখা হয় এবং ইসলাম উদ্দিন তাকে বিয়ে করে। দীর্ঘদিন নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে গত ১৯.৫.৯৭ তারিখে মধ্যরাতে বিষ খাইয়ে ভৈরবীকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর ২১মে' ৯৭ সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কাউকে না জানিয়ে তড়িঘড়ি করে ময়না তদন্ত শেষ করে লাশ কোম্পানীগঞ্জে না নিয়ে সিলেট শহরতলীর খাদিমনগর ইউপি'র পীরেরগাঁও -এ দাফন করা হয়। প্রভাবশালী মহলটি শুক্লর পরিবারকে এ ব্যাপারে মুখ খুললে আরেকটি 'নিদারাবাদ' ঘটনার হুমকি দেওয়ায় অসহায় পরিবারটি নিজেদের বাড়ি-ঘড় ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। সিলেট জেলার

সদর থানার হরিনাথপুর গ্রামের পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা মৃত পার্বতী চরণ চক্রবর্তী প্রায় তেইশ একর জমি জাল দলিল সৃষ্টি করে একই গ্রামের মেয়াদ উল্লাহর পুত্র বিহান উদ্দিন ওসমানের পুত্র মিছিল আলী প্রমুখ অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে তারা নিজ নিজ নামে নাম জারী করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। সিলেটের জৈন্তাপুর রাজাবাড়ীতে বিষ্ণুমন্দিরের স্থানে একটি মাদ্রাসা নির্মাণের অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন উক্ত স্থানে মাদ্রাসা নির্মাণের অনুমতি প্রত্যাহার করলেও একাংশ এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ভোলার তজমুদ্দিন থানার শশীগঞ্জ বাজারের অন্তর্গত এম.এ. ২১০ খতিয়ানে হাল ৪৪৮৫ দাগের পশ্চিমাংশের ১০ একর ভূমি ও উহার উপরিস্থ ৩৩ বন্দের ২ খানা জুরিন্দা টিনের চৌচালা ঘরের মালিক মৃত হরমোহন শীলের পুত্র নারায়ণচন্দ্র শীল সম্প্রতি দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত এলাকার মোঃ ফরিদউদ্দিন, মোঃ মজিজুল ইসলাম, মোঃ আঃ মান্নানসহ তাদের কতিপয় সহযোগী দখল করার চেষ্টা করছে। ইতিপূর্বে ভোলা জেলার তজুমদ্দিনে সহকারী জজ আদালতের মামলায় (নং ১৫/৯২), নারায়ণচন্দ্র শীল জয়লাভ করেছে। সম্প্রতি ৯.৬.৯৭ তারিখে উক্ত সন্ত্রাসীরা জোরপূর্বক নারায়ণচন্দ্র শীলের জায়গায় ঘর তুলেছে। ঘরছাড়া করে নারায়ণ ও তার পরিবারকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে।

দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়িঘরসহ যাবতীয় সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য হবিগঞ্জ জেলার আউলিয়াবাদ গ্রামের চন্দ্রধর দেব পটলের পরিবারের ৮ জন সদস্যকে ২৬ মার্চ' ৯৭ বাড়ী থেকে অপহরণ করা হয়।

বাড়ির আসবাবপত্র সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকা অবস্থায় পরদিন একই গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি দলবল নিয়ে চন্দ্র দেবের বাড়ী দখল করতে যায়। আশপাশের লোকজন বাধা দিলে প্রভাবশালী ব্যক্তি জানায়, বাড়িঘরসহ যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে চন্দ্রধর তার পরিবার পরিজন নিয়ে ভারতে চলে গেছে। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রির কাগজপত্র দেখাতে তিনি ব্যর্থ হন। গ্রামবাসীদের বাধার কারণে প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে লোক সম্মুখ থেকে চলে যান। গ্রামবাসীরা জানায়, ঐ ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিরীহ হিন্দু চন্দ্রধর দেবের পরিবারের সব সম্পত্তি আত্মসাতের পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছিল। গ্রামে তার একটি নিজস্ব বাহিনীও আছে। এই জেলার সাঁথিয়া থানার আতাইকুলা হরিবাড়ী মন্দিরটির সম্পত্তি অবৈধভাবে দখলের জন্যে মোঃ ছগিরউদ্দিন, মোস্তফা হেলাল, নজরুল ইসলাম, পিতা মৃত ফকির মাহমুদ, গ্রাম-সড়াভাঙ্গী, লিয়াকত আলী, মোজহার আলী, প্রমুখেরা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সন্ত্রাসীরা সুপরিকল্পিতভাবে ১৯৯০ সালে মন্দির দখলের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সম্প্রতি আবার দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং এলাকাবাসী হিন্দুদের হত্যা ও দেশত্যাদের হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার চণ্ডীদাসী গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন ধরে একটি শ্মশান ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর সর্বজনীন শ্মশানের জায়গা দখল করার জন্য কুচক্রী মহলের তৎপরতায় উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনো গৃহীত হয়নি। ফরিদপুর জেলার কোতয়ালী থানার আলীপুর গ্রামের প্রভাতচন্দ্র রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের আলীপুর মৌজার ৩৮৮ খতিয়ানে ২৭৭ দাগের ৫৪ শতক জমি একশ্রেণীর কর্মচারী অবৈধভাবে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে দায়ের করা মামলায় দিলীপকুমার জয়ী হলেও বর্তমানে উক্ত সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই জেলার আলফাডাঙ্গা থানার বেলবায়না মৌজায় প্রায় পাঁচশত বছরের পুরনো শ্মশান-এর জমি অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে একই এলাকার আবদুল হাই মোল্লা, ওহাব মোল্লা, মোশারফ মোল্লা, আশরাফ মোল্লা, মোহাম্মদ মোল্লা, সবুর মোল্লা, কামরুল মোল্লা সহ একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী মহল। সন্ত্রাসীরা শ্মশানে দাহ করতে বাধা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে এলাকার হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার ফুকরা গ্রামের স্কুল শিক্ষক সুকুমারচন্দ্র সরকারের কন্যা সালথা জুনিয়র হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী প্রতিমা সরকার (সুমা) ৩০.০৬.৯৭ তারিখে একই গ্রামের হামেদ মোল্লার পুত্র মনিরুজ্জামান মোল্লা (মনির) কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় মামলা হয়েছে আসামী পলাতক। আসামীর পিতা হামেদ মোল্লা সুকুমার সরকারকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং প্রাণনাশ ও উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে। এই থানার বানা ইউনিয়নের বানা শ্মশান ঘাট প্রায় পাঁচ শ' বছরের পুরনো। সম্প্রতি এক প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্মশান ঘাটের জমি অবৈধভাবে দখল করে হিন্দু সম্প্রদায়কে শবদাহ করতে বাধা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে উক্ত এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানাধীন বড়ডাংগা গ্রামের বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, পিতা কানাইলাল বিশ্বস, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, অঘোর বিশ্বাস, সুফলা দাসী পিতা কানাইলাল বিশ্বাস, প্রভাবতী বিশ্বাস, স্বামী বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, এবং অমলকৃষ্ণ বিশ্বাস, পিতা লালচাঁদ বিশ্বাসদের ১৫.৯৭ একর জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দেলোয়ার হোসেন খান, পিতা ইউসুফ আলী খান, গোলনা, ডুমরিয়া দখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিপূর্বে উক্ত জমি দখলের জন্য দু'বার মামলা দায়ের করেও প্রতিপক্ষ হেরে গেছে। বিগত জরিপের সময় উক্ত দেলোয়ার হোসেন সন্ত্রাসীদের সাহায্যে জমির প্রকৃত মালিক বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাসের জমিতে নামতে বাধা দেয় এবং অবৈধ দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানায় দেবী গ্রামের সুনীলকুমার বিশ্বাসের কন্যা স্বপ্নারাণী বিশ্বাসকে ১৮.০৯.৯৭ তারিখে একই গ্রামের মকছেদ খন্দকারের পুত্র ঝন্টু খন্দকার ও মোহব্বত খন্দকারসহ ১২/১৩ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে

লোহাগড়া থানায় মামলা দায়ের করা হলেও অদ্যাবধি স্বপ্নাকে উদ্ধার করা যায়নি। আসামীরা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য সুনীল বিশ্বাসের উপর চাপ দিচ্ছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

নড়াইল জেলার কালিয়া থানার চাচুড়ি পুরুলিয়া ইউনিয়নের ধাড়িয়াঘাটা গ্রামের জয়দেব বিশ্বাস ও তার পরিবার পরিজন জীবনের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এলাকার হেমায়েত মোল্লা, পিতা ফুলমিয়া, সরুফু শেখ পিতা মজিদ, মনি শেখ, পিতা কুটি মিয়া, বাদশা শেখ, মিন্টু শেখ, বাচ্চু শেখ, হারুন শেখ, পিতা জলিল শেখ, রাজিব মোল্লা, পিতা হেমায়েত, আকরাম শেখ, পিতা মন্তাজ শেখ প্রভৃতিরা জাল দলিলের মাধ্যমে জয়দেব বিশ্বাসের জমি অবৈধ উপায়ে দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা জয়দেবকে হুমকি দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কালিয়া নালিশী আদালতে মামলা হয়েছে। মামলা নং–সি, আর ৫৪৭/৯৫।

১৫.১০.৯৭ সন্ধ্যা ৭টায় লক্ষ্মীপূজা চলাকালে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানার চদেগোজি গ্রামের পূজা মণ্ডপে উক্ত গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার ও তার স্ত্রীসহ কতিপয় সন্ত্রাসী প্রতিমা ভাঙচুর করে মন্দিরের জায়গা দখলের চেষ্টা করে। এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে এ ব্যাপারে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নওগাঁ জেলার ধামইর হাট থানার ইসবপুর ইউনিয়নের বৈদ্যবাটী গ্রামের পাখীরামসহ ২০/২৫টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার দীর্ঘদিন ধরে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত গ্রামের মোঃ আবদুর রহিম, পিতা মোঃ মোজাম্মেল হক (পচা) পাখিরাম ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জায়গা জমি বিভিন্নভাবে নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে জবর দখলের চেষ্টা করছে। ২৫.৩.৯৭ তারিখে উক্ত মোঃ আব্দুর রহিমসহ তার সহযোগীরা পাখিরামের ক্ষেতের ফসল জোরপূর্বক কেটে নেয়। প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে এ ব্যাপারে দুষ্কৃতকারীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে।

কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার শ্রী শ্রী লক্ষ্মী গোবিন্দ বিগ্রহের সেবায়েত শ্রী হরিপ্রসন্ন সাহা দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবাকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি উক্ত দেবোত্তর এস্টেট এর মাঠ জরিপ কাজে স্বার্থান্বেষী মহল বাধা দিচ্ছে এবং মন্দিরের সম্পত্তি নিজ নামে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এইজেলার বরুড়া থানাধীন পশ্চিম ইল্লাশপুর গ্রামের অমরচন্দ্র পাল, পিতা মৃত রাজমোহন পাল, এর ২.২.৯২ তারিখে একই গ্রামের গনি মিয়া, পিতা মৃত আলী আহমদ, মালেক মিয়া, পিতা মৃত মহবত আলী, চাঁন মিয়া, পিতা মইদর আলী, তৈয়ব আলী, পিতা মৃত আলী আহমদ, লতিফ মিয়া, পিতা মৃত ফজর আলী, গ্রাম টামটা, চান্দিনা তাদের সন্ত্রাসী দল নিয়ে তার বসতবাড়ী দখল করে নিয়েছে। উক্ত সন্ত্রাসী দল বর্তমানে অমর পালের বাড়িতে মদ, জুয়ার আড্ডা খানা বসিয়েছে। বসতবাড়ী থেকে উৎখাত হয়ে অমর পাল এবং তার বৃদ্ধা মা পথে পথে ঘুরছে।

কোতোয়ালী থানার রাজরাজেশ্বরী কালীবাড়ির মালিক প্রয়াত জ্যোতিভূষণ দত্ত মৃত্যুকালে তাঁর শহরস্থ ১.১৫ একর জমির উপর অবস্থিত দোকান মন্দির এবং জমির আয় জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় হবে বলে উইল করে যান। উইল মতে জ্যোতিভূষণ ট্রাস্ট কমিটি গঠিত হয় এবং ট্রাস্টের আয় রাজরাজেশ্বরী কালীবাড়ী, কাত্যায়নী কালীবাড়ী, আর কে অনাথ আশ্রম, চান্দীমুড়া কালীবাড়ী, বৌদ্ধ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষী মহল উক্ত উইলের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে এবং সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি গৃহীত হয়নি।

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার গোপালপুর ইউনিয়নের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম (গোপালপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম) একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তিযুদ্ধে চলাকালে এই সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানটির সিংহভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত হয়। মোঃ ইদ্রিছ মিয়া, পিত মৃত হাজী আবিদ মিয়া প্রভৃতিরা দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে উক্ত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক ডাঃ যতীন্দ্র নাথকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

পটুয়াখলী জেলার মুরদিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী সন্তোষকুমার ঘোষাল উক্ত ওয়ার্ডের অপর মেম্বার পদপ্রার্থী খোরশেদ আলী চাকলাদার ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে। ৪.১২.৯৭ তারিখে উক্ত খোরশেদ আলী চাকলাদার তার দলবলসহ ধর্মীয় সংখ্যলঘুদের বাড়ি-ঘরে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বর্তমানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক হামলা

। ১৯৮৯ ।

১৫ এপ্রিল হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) সি.আর. দত্তকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ও বোমা বর্ষণ করা হয়। জেনারেল দত্ত গুলিস্তানের টি এন্ড টি ভবনে টেলিগ্রাম সেরে সস্ত্রীক নিজের গাড়িতে করে বাসায় ফেরার পথে তিন নেতার মাজারের কাছে একটি নীল রঙের জীপ পাশ থেকে তাঁর গাড়িকে ধাক্কা দিলে গাড়ি থেমে যায়। জীপ থেকে সশস্ত্র কয়েক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তে থাকলে তিনি মাথা নিচু করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এই অবস্থায় তাঁর উপর উপর্যুপরি কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে সশস্ত্র ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় জেনারেল দত্তকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে অস্ত্রোপচার করা হলে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৫ সেপ্টেম্বর খুলনা শহরে জন্মাষ্টমীর পুনর্মিলনী শেষে শোভাযাত্রা বের করা হলো উক্ত শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণকালে তারেরপুকুর নামক স্থানে এলে পরিকল্পিতভাবে একদল অস্ত্রধারী লোক শোভাযাত্রার উপর হামলা করে। এই হামলার ফলে শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং বেশ কয়েক জন ধর্মপ্রাণ হিন্দু আহত হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থানার নিদারাবাদ গ্রামের শশাঙ্ক দেবনাথকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয় ১৯৮৭ সালের ১৬ অক্টোবর। এই হত্যাকাণ্ডের পরেও শশাঙ্ক দেবনাথের এগার কানি জমি দখল করতে ব্যর্থ হয়ে ৫ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক দেড়টায় ঘরের দরজা ভেঙ্গে শশাঙ্ক দেবনাথের স্ত্রী বিরজাবালা (৪৫), ছেলে শুভাষ দেবনাথ (১৩), সুমন দেবনাথ (৭), অপর ছেলে সুজন দেবনাথ (৩), মেয়ে মিনতিবালা দেবনাথ (১৭) ও প্রণতি দেবনাথকে (১১) অপহরণ করে চোখমুখ বেঁধে একটি নৌকায় তুলে নিদারাবাদ থেকে দু' কিলোমিটার দূরে ধোপাবাড়ি খালের পাশে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করা হয় এবং ছয়টি মানুষের দেহের টুকরো টুকরো অংশগুলি ছ'টি ড্রামের ভেতর চুন মেখে খালের গভীর পানির নীচে পুতে রাখা হয়। শশাঙ্ক দেবনাথের হরষপুর ইউনিয়নের বাজার সংলগ্ন এগার কানি জমি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে তাজুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, নজরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান, ইনু প্রমুখরা ৮৭ সনের ১৬ অক্টোবর শশাঙ্ক দেবনাথকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করার পর উক্ত তাজুল ইসলাম জনৈক মৌলভী ইব্রাহিমসহ সেই জমি কিনে নিয়েছে বলে দাবী করে। মৌলভী ইব্রাহিম প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এফিডেভিটের মাধ্যমে তিনি এই জমি ক্রয় করেননি বলে আদালতকে জানান। ফলে তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাল দলিলের

মামলা শুরু হয়। আর এই মামলা চালিয়ে আসছিলেন শশাঙ্ক দেবনাথের স্ত্রী বিরজাবালা। ৫ মার্চ রাতে উক্ত তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

১০ মার্চ একটি হিন্দু সংগঠনের গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির উদ্দোগে রাখদিয়ায় আয়োজিত এক জনসমাবেশ শেষে সংগঠনের কর্মীরা বাড়ি ফেরার পথে পুইশুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম লোকজন নিয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় ২৩ জন কর্মী আহত হয়। ১১ মার্চ ভোলার লালমোহন থানার শ্রী শ্রী মদনমোহন আখড়ায় নাম কীর্তন চলাকালে দ্বিতীয় দিনে বেলা দশটার দিকে স্থানীয় কয়েকজন চিহ্নিত ব্যক্তির নেতৃত্বে শতাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি কীর্তন মণ্ডপে হামলা করে। সন্ত্রাসীরা মন্দিরে প্রবেশ করে ভক্তদের মারধোর করে এবং প্রতিমা ভাঙচুর করে। এছাড়া সন্ত্রাসীরা দত্তপাড়াতে বিভিন্ন মন্দিরে প্রবেশ করে ভাঙচুর করে, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

গোপালগঞ্জের সদর থানার বৌলতলী বাজারের দক্ষিণ পাশে স্লুইচ গেটের উপর ২৫ মার্চ বিকালে করপাড়া ইউনিয়নের বনগ্রামের এনজেল হক মজুমদার, বুলবুল মোল্লা, আবুল বাশার মোল্লা, বরকত আলী সিকদার জলিপাড়ের ধন্য বৈরাগী নামে একজন ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই করে এবং পদ্মবিলায় রমেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের বাড়ি চড়াও হয়ে টাকা দাবি করে, অন্যথায় প্রাণনাশের হুমকী দেয়। ২৯ মার্চ রাতে উক্ত সন্ত্রাসীরা কংশুরা গ্রামের হিন্দু নাগরিকদের ওপর হামলা চালায়। তারা মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে। যাবার সময় হিন্দুদের দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে যায়।

কুমিল্লার ঐতিহাসিক অভয় আশ্রমে দীর্ঘদিন থেকেই বাংলা নববর্ষ পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু গত নববর্ষের দিন প্রার্থনা চলাকালে দুস্কৃতিকারীরা ঢিলছুড়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়। প্রতি বছর ৭ বৈশাখ ত্রিপুরা মহারাজা প্রতিষ্ঠিত ময়নামতীর রানীর বাংলা সংলগ্ন কালী বাড়িতে বিগ্রহরূপী কালীগাছটিকে কেন্দ্র করে বৈশাখী মেলা ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গত পয়লা বৈশাখ গাছটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। কুমিল্লা শহরের মধ্যখানে কাপড়িয়া পট্টির লক্ষীনারায়ণজীর আখড়ায় প্রতি রোববার ভগবৎপাঠ ও সন্ধ্যাপূজারতি হয়ে থাকে। সম্প্রতি অনুষ্ঠানে ঢিল ছোড়া হলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও পরবর্তী পর্যায়ে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয়। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণাংশে ত্রিপুরার মহারাজা প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও চণ্ডীমন্দির যুগ যুগ ধরে ভক্ত সমাগমে মুখর হয়ে আসছিল। কিন্তু কিছু দিন আগে দুস্কৃতিকারীরা জোর করে মন্দিরের মূল্যবান গাছপালা কেটে নিয়ে গেছে এবং সেবায়েতকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। দাউদকান্দির থানার সিঙ্গলা গ্রামের পূজামণ্ডপ থেকে গত বছর যে শিবমুর্তি অপহরণ করা হয় তা পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি এবং ইলিয়টগঞ্জ বাজারের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবান কালীমুর্তি দুস্কৃতিকারীরা অপহরণ করে নিয়ে যাবার এক বছর পরেও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

। ১৯৯০ ।

ভারতের বাবরী মসজিদ রামমন্দির বিরোধকে উপলক্ষ করে ৩০, ৩১ অক্টোবর এবং তৎপরবর্তী সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য স্থানে মৌলবাদী সম্প্রদায়িক শক্তি

হাজার হাজার মন্দির, উপাসনালয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ঘর বাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস করেছে। কয়েক হাজার মূর্তি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়, বহু ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়। ফলে হাজার হাজার পরিবার হয়ে পড়ে সহায় সম্বলহীন। প্রায় অর্ধশত নারীকে করে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত। ক্ষমতাসীন এরশাদ সরকার এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা করে এবং মদদ জোগায়– এরকম অভিযোগ রয়েছে। এই নারকীয় ও মর্মান্তিক ঘটনায় সারা দেশের বিবেকসম্পন্ন মানুষই শুধু নয়, বিশ্ববাসীও হতবাক হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সনের নভেম্বরেও একই উপলক্ষকে সামনে রেখে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল। ১৯৯০ এর ৩০ ও ৩১ অক্টোবর এবং তৎপরবর্তী সময়ে যে ধ্বংস যজ্ঞ চালানো হয় তার আংশিক বিবরণ এরকম–

ঢাকার লালবাগ থানার আওতাভূক্ত শত শত বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ঢাকেশ্বরী মন্দির। সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মাস্তান বাহিনী এই মন্দির এবং মন্দিরের অন্যান্য ঘরবাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। মন্দিরের সেবায়েতের বাসগৃহসহ এগারটি পরিবারের প্রতিটি ঘরে আগুন দেয়া হয়, ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। সেবায়েত আহত অবস্থায় দেয়াল টপকে পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন। দীর্ঘ চার ঘন্টা ধরে এই মন্দিরে চলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার তাণ্ডবলীলা। হাজারীবাগের ৩৫ ভাগলপুর লেনের শ্রী শ্রী কালী মন্দির, ৪৯ ভাগলপুর লেনের শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির এবং ১১৯ ভাগলপুর লেনের (হাজীপুর জেলেপাড়া) শ্রী শ্রীদূর্গা মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এসব মন্দিরের প্রতিমা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। ২৬০ লালবাগ রোডের শ্রী শ্রীদুর্গা মন্দির ও রাধামাধব মন্দিরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। লালবাগ রোডের পুষ্পরাজ সাহা লেনের শ্রী শ্রী গিরিগোবর্ধন জিউ মন্দির লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়।

৯৬-৯৭, হরনাথ ঘোষ লেনের সারঙ্গধর রঘুনাথ জিউ আখড়ায় ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। লালবাগ কামরাঙ্গিচর শ্মশানে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। নগর বেলতলী লেনের রামানন্দ দাস, গৌরাঙ্গচন্দ্র দাস, শম্ভুনাথ দাস, অনিল দাস, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রত্না দাস, পূর্ণচন্দ্র দাস, হরিচরণ দাস, জগদীশচন্দ্র দাস, লক্ষণচন্দ্র দাস, ধীরাজচন্দ্র দাস, স্বপনকুমার দাস, ব্রজনাথ দাস, চণ্ডী দাস, বুধাই দাস,উত্তমকুমার দাস, বিক্রমকুমার দাস চাপাতির আঘাতে আহত হয়েছেন। এছাড়া লালবাগ রোড ও হরনাথ ঘোষ রোডের পঞ্চাশটির বেশী হিন্দু বাড়ি ও দোকান লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে মৌলবাদী গোষ্ঠী। নগর বেলতলী এবং হাজারীবাগ এলকায় আরো প্রায় একশটি বাড়ি ও দোকান এবং এক ডজন ছোট বড় মন্দিরে হামলা চালিয়ে লুট ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সূত্রাপুর থানা এলাকায় ১৯, জয়কালী মন্দির রোডের রামসীতার আখড়ায়, বি সি, সি রোডের শিবমন্দির, নবাবপুর রোডের রাধেশ্যাম জিউরমন্দির, লক্ষীনারায়ণ জিউর মন্দির, নরেন্দ্রনাথ বসাক লেনের ভগবৎ অনুশীলন মন্দির, ২৫৭ নবাবপুর রোডের মহাবীর মন্দির, লালমোহন স্ট্রীটের শিবমন্দির, মহাজনপুর লেনস্থ শীতলা মন্দির ও দূর্গা মণ্ডপ, ২৪, উত্তর মৈশুন্ডীর ভাগবত মন্দির, চন্দ্রমোহন বসাক লেনের গোবিন্দ মন্দির, নারিন্দা শরৎ গুপ্ত

রোডের মধুসূদন নারায়ণ মন্দির, ১৭ নারিন্দা লেনের কালাচাঁদ জিউরমন্দির, হৃষিকেশ দাস রোডের কালীমন্দির, নারিন্দার বিখ্যাত মাধব গৌড়ীয় মঠে হামলা, ভাঙচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মঠ, মন্দির, আশ্রম ছাড়াও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ১৪ বিসিসি রোডের নিউ কালুলাল সুইটস, বাবুলাল সুইটস, নিত্যলাল সুইটস, ঠাঠারী বাজারের বিশ্বনাথ ঘোষ ও কালু ঘোষের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ১৪১ নবাবপুর রোডের ছানাঘর, ১৭০ নবাবপুর রোডের মরণচাঁদ এন্ড কোং, ৩১ নবাবপুর রোডের মধুমিতা ষ্টোর, ২৯/১ নবাবপুর রোডের ননীগোপাল ঘোষের দোকান, ১৯ নবাবপুর রোডের বিউটি সুইটস, ১৮/১ নবাবপুর রোডের লালচাঁদ ঘোষ এন্ড সন্স, ১৮ নবাবপুর রোডের মরণচাঁদ এন্ড সন্স, ২৬২ নবাবপুর রোডের সাহা বণিকদের দোকান, ২৭ টিপু সুলতান রোডের এস কে কর্পোরেশন, ১৯ জয়কালী মন্দির রোডের দুলালচন্দ্র ঘোষ, নির্মলচন্দ্র ঘোষ ভোলানাথ সিংহের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ৮০/৪ দয়াগঞ্জ বাজারস্থ তৃপ্তি মিষ্টান্ন ভান্ডার, শরৎগুপ্ত রোডের সাধনা ঔষধালয়, ৪৫ বাংলা বাজারের ঢাকেশ্বরী বাসনালয়, ৫০ বাংলাবাজারের লোকনাথ কুটির, ১৪ প্যারিদাস রোডের চাঁদনী চিকিৎসালয়, ফরিদাবাদের ২৭ কে বি রায় রোডের গণেশ মিষ্টান্ন ভান্ডার, ৫২ ঋষিকেশ দাস রোডের মিনা জুয়েলার্স, ১০৬ ঋষিকেশ দাস রোডের এডভোকেট রমণীকান্ত ভট্টাচার্যের চেম্বারসহ সূত্রাপুর থানা এলাকায় শতাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে হামলা করে ভাঙচুর, লুটপাট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

কোতোয়ালী থানার পাটুয়াটুলীর ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মসমাজের অফিস ও লাইব্রেরী, শাঁখারী বাজারের শ্রীধর বিগ্রহ মন্দির, নয়াবাজারের প্রাচীন মঠ, কায়েৎটুলীর হর্ষনাথ সেনের বাড়ির প্রখ্যাত সাপ মন্দির মৌলবাদীরা হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও পাটুয়াটুলীর এম, ভট্টাচার্য এন্ড কোং নামের প্রসিদ্ধ হোমিও ঔষধের দোকান, হোটেল রাজ, ঢাকেশ্বরী জুয়েলার্স, বাদ্যযন্ত্রের প্রসিদ্ধ দোকান যতীন এন্ড কোং, সদরঘাট মোড়ের ভি. আই. পি. স্টোর (অধুনালুপ্ত), ইসলামপুরের সোহাগ জুয়েলার্স, নিউ ঘোষ জুয়েলার্স, আল্পনা জুয়েলার্স, কাশ্মিরী বিরিয়ানী হাউজ, জয় বুলিয়ন স্টোর, রূপশ্রী জুয়েলার্স, মানসী জুয়েলার্স। ৪৯ পাটুয়াটুলীর গোবিন্দ বনিক নামের সোনা রূপার কারখানা, মিতালী জুয়েলার্স, শুকলাল মিষ্টান্ন ভান্ডার, শাখারী বাজারের নিউ শিলা বিতান, সোমা ষ্টোর, সাহা ক্যান্টিন, সদরঘাট বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর নৌকায় ভাসমান হিন্দু হোটেল উজালা, পান্থনিবাস, নয়াবাজারের সুইপার কলোনী সহ কোতোয়ালী থানা এলাকায় কমপক্ষে একশ বাড়ি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে মৌলবাদীরা, তারা শুধু হামলাই করেনি লুট এবং অগ্নিসংযোগও করেছে। তাছাড়া রমনা থানার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ মতিলাল সুইটস, পুরানা পল্টনের মরণচাঁদ গ্রান্ড সন্স, গুলশান থানার রামপুরা বাজারের বেশ কিছু হিন্দু দোকান এবং মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকার বেনীমাধব মিষ্টান্ন ভান্ডার, অশোক জুয়েলার্সসহ রায়ের বাজার এলাকার প্রতিটি

হিন্দু বাড়িতে এই অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি হামলা ও লুট করেছে। তারা রায়ের বাজার শ্মশান ঘাটটি ভাংচুর করেছে।

ডেমরা থানার জুরাইন এলাকার শংকর সাধুর আশ্রম, শ্রীশ্রী রামলক্ষণ জিউ, মাতুয়াইলের শনি মন্দির, কালীমন্দির, রাজারবাগ কালীমন্দির লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়া যুগলচাঁদ সরকার, বিশাখারানী দাস, সহদেব মণ্ডল, স্বপনচন্দ্র দাস, হরি আনন্দ দাস, জীবনচন্দ্র দত্ত, তারাপদ শীল, হেমন্তচন্দ্র দাস, ফুলচাঁদ দাস, মনীন্দ্রচন্দ্র দাস, নগেন্দ্র চন্দ্রদাস, শিবুচন্দ্র দাসসহ এই থানার প্রায় দুইশ' হিন্দুর বাড়ি আক্রমণ করা হয়েছে। মৌলবাদীরা তাদের বাড়ি লুট করেই ক্ষান্ত হয়নি, অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিসংযোগও করেছে। ঢাকা শহরের অন্যান্য থানার হিন্দুদের উপরও অনুরূপ নির্যাতন, হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ঢাকার জেলার কেরানীগঞ্জ থানার চুনকুটিয়া পূর্বপাড়ার হরিসভা মন্দির, কালীবাড়ির কালীমন্দির, মীরেরবাগের মন্দির, গোশম বাজার আখড়া, শুভ্যাডা চন্দ্রানিকারার মন্দির, পশ্চিম পাড়ার কালীমন্দির, শ্বশান ঘাট, তেঘরিয়ার রামকানাই মন্দির, কালিন্দী বড়ীশর বাজারের দূর্গা, কালী ও মনসা মন্দিরে হামলা, লুটপাট মূর্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। শুভ্যাডা ইউনিয়নের খেজুরবাগ এলাকার প্যারিমোহন মিশ্রের পুত্র রবি মিশ্রের বাড়িসহ প্রায় পঞ্চাশটি ভাড়াটিয়া হিন্দু পরিবারের উপর হামলা চালিয়ে লাঞ্ছিত ও লুটপাট করা হয়। তেঘরিয়ার পূর্বদীর ভবতোষ ঘোষ, পরিতোষ ঘোষ,কালিন্দীর মান্দাইল হিন্দুপাড়ায় এবং বনগাঁও ঋষিপাড়ার প্রায় তিনশ বাড়ি ভাঙচুর, লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ মুড়াপাড়া থানার পঞ্চাশটির বেশী হিন্দু বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গলাচিপা ও গোপালপাড়ায় কয়েকটি বাড়ি ও দোকানে হামলা এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বন্দর শ্মশান ঘাট ও পাগলায় কয়েকটি হিন্দু বাড়ি ও দোকানে হামলা করেছে মৌলবাদীরা।

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার বালিগাও ঋষিপাড়ায় প্রায় দুইশ বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রহিমাবাদে একটি মন্দির ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং ৩১ অক্টোবর রাতে সদর থানার কান্দাপাড়ায় একজন হিন্দু ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। সিলেট সদর থানার প্রায় এক ডজন মন্দিরে হামলা করে প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলেছে মৌলবাদীরা। হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা করে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করেছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। যশোর সদর থানার মাড়োয়ারী মন্দির, বেজপাড়া মন্দির, কালী মন্দির, ভুবতি বাড়ির মন্দির, এবং নওয়াপাড়া বাজারের হিন্দু দোকান ও বাড়িতে হামলা, লুটপাট, প্রতিমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। ঝিনাইদহ সদর থানা ও শৈলকুপা থানায় হিন্দু বাড়িতে দোকানে হামলা ও লুটপাট করেছে সন্ত্রাসীরা। রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি থানার কাত্যায়নী মন্দিরসহ বারটি মন্দির ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। পাবনার রাধানগর ও পায়রাতলায় দু'টি হিন্দু বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ

করা হয়। ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানায় ২ নভেম্বর প্রায় এক ডজন মন্দিরে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। এই থানার কামার গ্রামে দশটি হিন্দু বাড়িতে হামলা করা হয়। বরিশালের ঐতিহ্যবাহী রাধামন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। শ্মশানের কালী মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। শ্মশানে আরো কয়েকটি মঠ এবং কোতোয়ালী থানার কাশীপুরের প্রখ্যাত মহামায়ার মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের জামুর্কি মন্দিরে এবং সদর উপজেলার বামাকানপুর মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার জুরানপুর ও কামারকান্দি গ্রামের হিন্দু বাড়িতে হামলা করে তছনছ করেছে মৌলবাদীরা।

লক্ষীপুর জেলার রামগতি থানার চর আলেকজান্ডারের করুণানগর এলাকায় কয়েকটি মন্দির ও বাড়ি এবং ১৪টি দোকান ভাঙচুর, লুট ও অগ্নিসংযোগ করেছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। অক্টোবরের সাম্প্রদায়িক হামলায় চট্টগ্রামের মহানগরীর ঐতিহাসিক কৈবল্যধাম, চট্টেশ্বরী কালীবাড়ি, পঞ্চাননধাম আশ্রম, বক্রীর হাট হরিসভা মন্দির, শ্রীগুরু ধামের সিংহ আখড়া, কোরবানীগঞ্জ কালীবাড়ি, অভয় মিত্র মহাশ্মশান, নাথপাড়া কালীমন্দির, দেওয়ানশ্বরী কালীমন্দিরসহ কয়েকটি মন্দিরে হামলা, লুটপাট, বিগ্রহ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই মহানগরীর সৎ সঙ্গ আশ্রম,দত্তাত্রেয় আখড়া ও রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্ত মন্দির ও উপাসনাগারে মৌলবাদীরা হামলা করেছে। চকবাজার, রিয়াজউদ্দিন বাজার, পাথরঘাটা, বাকলিয়া, বালুয়ার দীঘি, জামাল খান,বন্দরহাট ইলিয়াস কলোনী, কৈবল্যধাম মালিপাড়া, ষোলশহর এক নম্বর গেট, আন্দরকিল্লাসহ শহরের বিভিন্ন এলাকার হিন্দু বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং ভাঙচুর করা হয়। সমগ্র শহরে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ও দোকানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। মৌলবাদীরা হিন্দু সম্পত্তির মতো এসব এলাকায় হিন্দু নারীদের সম্ভ্রম লুটে নিয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রামের উত্তর এলাকায় সাম্প্রদায়িক শক্তির হামলায় সাত হাজার হিন্দু পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং প্রায় সাত হাজার হিন্দু নারী পুরুষ শিশু আহত হয়েছে। ধর্ষণ করা হয়েছে অসংখ্য নারীকে। তিনজন মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন হাজার পরিবার । নিহত হয়েছে একজন এবং নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা অসংখ্য।

১৯৯১ সনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষপদে ছিলেন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ। এই বছরের সিংহ ভাগ সময় তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সব দিক থেকেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন একমাত্র অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রপতি। জিয়াউর রহমান এদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়েছেন। এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছেন এবং খালেদা জিয়া এদেশের চরম মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় বসেছেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের শাসন আমলে এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মোটামুটি ভাল ছিল।

। ১৯৯২ ।

ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির হাতে ১৯৯২ এর ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ আক্রান্ত হলে তার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে দেখা দেয় আরো বর্বরোচিতভাবে। স্বার্থান্বেষী মহলের কি এটা প্রতিক্রিয়া ছিল, নাকি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটানো হয়েছে এই অমানবিক ঘটনা ? এদেশের যে সব মানুষ ধর্মান্ধদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের ক'জন বলতে পারবে বাবরী মসজিদ কোথায়? বাংলাদেশের কোন হিন্দু কি কখনো হাজার মাইল দূরত্বের সরযূ নদীর তীরের বাবরী মসজিদ দেখেছে ? যদি দেখে না থাকে, তাহলে কেন তাদের উপর এই অত্যাচার নির্যাতন ?

অযোধ্যার বাবরী মসজিদ বিধ্বস্ত হবার পরে বাংলাদেশে ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষী শক্তির হামলায় আঠাশ হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে; এর মধ্যে সাড়ে নয় হাজার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। দুই হাজার সাতশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে। আর একটি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে তিন হাজার ছয়শ মন্দির ও উপাসনালয় সম্পূর্ণ ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করে। সাম্প্রদায়িক শক্তির হামলায় শুধু বাড়ি ঘর মন্দির বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই হামলায় আহত হয়েছে দুই হাজার মানুষ এবং হত্যা করা হয়েছে বারজনকে। নির্যাতন চালানো হয়েছে দুই হাজার ছয়শ মহিলা যুবতী তরুণীর উপর। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দুইশ কোটি টাকার উপরে। অসহায়, ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসনকল্পে সরকারিভাবে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এনজিওগুলো সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেও সরকারি অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে বেসরকারি এই সংস্থাগুলির অনেকেই সরকারি অনুমতির তোয়াক্কা না করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। পৌষের কনকনে শীতের মধ্যে সহায়সম্বলহীন হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নরনারীকে এনজিও কর্মীরা খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে দেখেছেন। এই সব অত্যাচারিত মানব সন্তানদের বস্ত্র নেই, খাদ্য নেই, মাথা গোঁজার ঠাই পর্যন্ত নেই। তাঁরা আরো দেখেছেন, ইজ্জত হারিয়ে হাজার হাজার মা বোন মূক হয়ে গেছেন। ব্যবসায়ীরা সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছেন, তাঁদের সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। অশুর শক্তির থাবা থেকে রক্ষা পায়নি পুরোহিত সন্নাসী কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দ্বারা মৌলবাদীদের এই তাণ্ডবলীলা খুব সহজেই রোধ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'পরিষদ বার্তা' ২৯ মাঘ ১৩৯৯ তারিখের লিখেছে, 'হামলার সময় প্রশাসন কোথাও কোথাও নিস্ক্রিয় ভুমিকা পালন করে, কোথাও বা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মদত যোগায়'। দেশের পাঁচটি বিভাগের সব ক'টিতে চলেছে এই ধ্বংস যজ্ঞ। চৌষট্রিটি জেলার তেতাল্লিশটি সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে মৌলবাদীদের হামলায়।

ঢাকা জেলায় ৭ থেকে ৯ ডিসেম্বর যে সব জায়গায় হামলা চালানো হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ– ঢাকেশ্বরী মন্দির ও মেলাঙ্গন, সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, জগবন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ, নারিন্দা গৌড়ীয় মঠ, ভোলাগিরি আশ্রমে মৌলবাদীরা

হামলা চালায়, স্বামীবাগের মন্দির ও সেবায়েতের বাড়ি লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ৭ ডিসেম্বর বিকেলে। এই মন্দির সংলগ্ন আরো অনেক হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, লুটপাট করে নিয়ে যায় বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র থেকে বাথরুমের বদনা পর্যন্ত। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর শনির আখড়ায় পঁচিশটি বাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ করা হয়। শনির মন্দির ও দুর্গামন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়, দয়াগঞ্জ জেলেপাড়া এবং নারিন্দা ঋষিপাড়ায় নির্বিচারে হামলা চালানো হয়। ৮ ডিসেম্বর ঠাঠারী বাজারের মন্দির ভাঙচুর করা হয়, সেই সঙ্গে অগ্নিসংযোগ। শান্তিনগরের জলখাবার মিষ্টির দোকান ও শতরূপা স্টোরে; ফার্মগেট, পল্টন ও নবাবপুরে মরণচাঁদের মিষ্টির দোকান, মতিঝিল ও টিকাটুলিতে দেশবন্ধু মিষ্টির দোকানে লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। একই দিনে আরো হামলা চালানো হয় ঋষিকেশ দাস রোডের শ্রীলক্ষী মিষ্টান্ন ভান্ডারে। ইমামগঞ্জের দুর্গামণ্ডপ, সোয়ারী ঘাটের মন্দির ও শ্যামপুরের মন্দিরে চলে হামলা ও ভাঙচুর। এই দিনই ধামরাইয়ের ঐতিহাসিক রথে অগ্নিসংযোগ করা হয়, কাগজিয়াপাড়া বুড়ির মন্দির, দক্ষিণপাড়া, পুকুরিয়া এবং কানিয়াজুড়ির কালীমন্দিরে চলে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংয়োগ। ডেমরার জুরাইনে শ্রী শ্রী রামলক্ষণ জিউ আশ্রমে হামলা করে দেবদেবীর মুর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়। নষ্ট করে ফেলা হয় পূজার আসবাব পত্র। নর্থ ব্রুক হল রোডে অবস্থিত সর্বজনীন পুজার কার্যালয়, জমিদার বাড়ি কালী প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ৭ ডিসেম্বর।

মানিকগঞ্জ জেলায় যে তাণ্ডবলীলা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ– এই জেলায় ৭ ও ৮ ডিসেম্বর এই দু'দিনের হামলায় ২৫টি মন্দির ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ত্রিশ জনকে আহত করা হয়। সদর থানার বকশুড়ি গ্রামের একদল লোক একটি হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করে। মানিকগঞ্জ শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং তা বলবৎ থাকা অবস্থায় একটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়। ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঘিওর বাজারে ১০টি হিন্দু দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ৯ ডিসেম্বর এই থানার পুকুরিয়া, বড়টিয়া, কার্জুনা এবং নালীগ্রামে অনেকগুলো বাড়ি ও মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। ৮ ডিসেম্বর ঘিওর থানার তেরশ্রী, দৌলতপুর থানার বিনোদপুর এবং সদরথানার বকারি, দঝুসরা, কালীখোলাসহ বিভিন্ন স্থানে চালানো হয় অনুরূপ তাণ্ডবলীলা।

ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার বাথুয়াদি গ্রামে ৭ ডিসেম্বর ২টি মন্দির, ১টি পূজামণ্ডপ এবং ত্রিশালে একটি কালীমন্দির ভাংচুর করা হয়, একই দিনে নরসিংদীর চালাকচর ও মনোহরদীতে মন্দির ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে লুট করা হয়। দুর্বৃত্তরা ১০ ডিসেম্বর এই জেলার রায়পুর থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের জগদীশের বাড়িতে কালীমূর্তি ভেঙে ফেলে এবং পার্শ্ববর্তী আরো কয়েকটি বাড়িতে হামলা করে। একই রাতে সদর থানার আললী গ্রামে একটি ঘর পুড়িয়ে দেয় এবং মনোহরপুরের একটি বাড়িতে আগুন দেয়া হয়।

গোপালগঞ্জ জেলার কুলার্স ও পাটগতি গ্রামের ৫টি মন্দির এবং লেবুর তলা, চিংগুড়ি ও নারায়ণজালি গ্রামে ১০ ডিসেম্বর সকালে ১৫টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে মৌলবাদীরা,

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে জামাতে ইসলামী ও খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বে একদল লোক এ সব বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বেশ কিছু বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়, এই গ্রামে একটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়, ১৫ ডিসেম্বর কোটালী পাড়ার সয়োগ্রাম ইউনিয়নের ৪টি মন্দির পুড়িয়ে দেয়ার পর বাড়ি ঘর লুট করেছে এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলায় আহত হয়েছে প্রায় এক ডজন লোক। ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার কয়েকটি মন্দিরে ও রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা এবং লুটপাট করা হয়। ৭ ডিসেম্বরের এই হামলায় মিশনের মহারাজ ও একজন ছাত্র গুরুতর আহত হন। গাজীপুরের দুর্গামন্দির ও মাধবমন্দিরে একই দিনে হামলা করা হয়, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া বাজার সংলগ্ন একটি মন্দিরে হামলা চালায় একদল যুবক। তার আগের দিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর সোনারগাঁয়ের কাশীপুরে একটি বাড়িতে হামলা করা হয়। এদিন বিকেলে শহরের লক্ষীনারায়ণ আখড়ার মন্দিরে কীর্তন চলাকালীন সময় কতিপয় যুবক আখড়ার মন্দিরের গেটে আগুন লাগিয়ে দেয়, ১১ ডিসেম্বর কোর্ট প্রাঙ্গণে 'হেফাজতে ইসলাম' নামক একটি সংগঠনের জনসভা শেষে সংগঠনের কর্মীরা হামলা চালায় মন্দির ও হিন্দু বাড়িতে। ১৬ ডিসেম্বর রাতে রামকৃষ্ণ মিশনে একদল মৌলবাদী হামলা করে, লুটপাটের পর মিশনে অগ্নিসংযোগ করে। ৭ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজবাড়ি জেলায় ৩০টি মন্দির ও সংলগ্ন বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১০ ডিসেম্বর মাদারীপুর জেলার পানিছত্র এলাকায় হিন্দু বাড়িতে আগুন দেয়া হয় এবং কালকিনি থানার কর্জপাড়া গ্রামে ১টি মন্দিরে হামলা করে। ১১ ডিসেম্বর রাতে বাদামতলা এলাকায় হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শেরপুরের কৃষি প্রশিক্ষায়তনে অন্নপূর্ণা মন্দির, শেরীঘাট আশানের কালীমন্দির এবং সরকারি কলেজ সংলগ্ন প্যারীমোহন জিউর মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয় ৭ ও ৮ ডিসেম্বর জামাতে ইসলামীর নেতৃত্বে। ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শহরের বাগগড়ি মন্দির ও গরহাটি এলাকায় ২টি মন্দির ভাঙচুর করে একদল দৃষ্কৃতিকারী। এরা আরো হামলা চালায় শেরীপাড়া কালীমন্দির ও শিববাড়ি কালীমন্দিরে। বাগবাড়ি এলাকায় একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর মিষ্টির দোকান লুট করা হয়। ৯ ডিসেম্বর রাতে মাধবদীর আনন্দী গ্রামে মন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে এবং মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। মির্জাগঞ্জ বাজারে ১টি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর এবং অপর ১টি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১০ ডিসেম্বর দুপুরে শেরপুর শহরের প্যারীমোহন মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয় সাম্প্রদায়িক শক্তি। কিশোরগঞ্জ জেলায় ৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে সদর থানার চরশোলকীয়া এলাকায় হিন্দুদের বাড়িতে অতর্কিতে হামলা করে বাড়িঘর লুটপাট ও ভাঙচুর করে একদল মৌলবাদী। তারা শহরের কালীবাড়িতে হামলা করে এবং সদরের শ্মশান ঘাটের দেয়াল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলে। জেলার অন্যান্য মন্দির ও শ্মশানে চালায় অনুরূপ তাণ্ডব।

বড়বাজার এলাকায় নির্মলচন্দ্র সাহার পাটের গুদাম, হরিদাস কৈরীর লজেন্স ফ্যাক্টরী ও ৩টি মুচি দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

মৌলবাদীরা চট্রগামে চালায় লোমহর্ষক তাণ্ডব, এই জেলার সন্দ্বীপ থানার বাউরিয়ায় ৩টি মন্দির, কালাপানিয়ায় ২টি মন্দির, মগধরায় ৩টি মন্দির, টেউরিয়ায় ২টি মন্দির, হরিশপুরে ১টি মন্দির, রহমতপুরে ১টি মন্দির, পশ্চিম সারিকাইতে ১টি মন্দির, মাইট ভাঙ্গায় ১টি মন্দিরে হামলা করে। পশ্চিম সারিকাইতে সুচারু দাসকে মারধোর করে তার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। টোকাতলিতে ২টি বাড়িতে হামলা ও লুটপাট করে দুইজনকে ছুরিকাঘাত করে। পটিয়া থানায় ২টি বাড়ি, ১টি মন্দিরে হামলা করে এবং লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। বাঁশখালি থানায় ৬টি বাড়ি আক্রান্ত হয় মৌলবাদীদের হামলায়, রাঙ্গুনিয়া থানায় ১২টি বাড়ি ৪টি মন্দিরে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। আনোয়ারা থানায় ৪টি মন্দির ও ১৭টি বাড়ি আক্রান্ত হয় সাম্প্রদায়িক শক্তির হামলায়, বোয়ালখালী থানার মেধস মুনির আশ্রম ও শ্যামরায় হাটে একটি কাপড়ের দোকানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। চট্রগ্রাম মহানগরী এলাকায় ঐতিহ্যবাহী কৈবল্যধাম, তুলসীধাম আশ্রম, অভয় মিত্র শ্মশান, শ্মশান কালীবাড়ি, কোরবালীগঞ্জ শ্রী শ্রী বরদেনবরী কালীবাড়ি, পঞ্চানন ধামসহ দশটি মন্দির বিধ্বস্ত ও ভস্মিভূত করা হয়। সদরঘাট কালীবাড়ি গোলপাহাড় শ্মশান মন্দিরে হামলা চালানো হয়। জামালখান রোডে ও সিরাজদ্দৌলা রোডের হিন্দু দোকান ভাঙচুর করা হয় এবং এনায়েত বাজার কে সি দে রোড ও ব্রীকফিল্ড রোডের বিভিন্ন দোকান ও বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। কৈবল্যধাম মালীপাড়ায় ৩৮টি বাড়ি এবং সদরঘাট জেলেপাড়ায় শতাধিক বাড়ি লুণ্ঠিত ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

আগ্রাবাদ জেলেপাড়া ও বহদ্দরহাটে ম্যানেজার কলোনীতে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। মীরেসরাই ও সীতাকুন্ড থানায় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়েছে। মীরেসরাইয়ের সাতবাড়িয়া গ্রামে ৭৫টি পরিবার মসদিয়া ইউনিয়েন ১০টি পরিবার, বেশরতে ১৬টি পরিবার, ৩টি মন্দির, ওয়েদপুরে ২০টি পরিবার, খাজুরিয়ায় ১২টি পরিবার এবং জাফরাবাদে ৮৭টি পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছে মৌলবাদীরা। এসব বাড়িঘরে লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সীতাকুণ্ড থানার মুরাদপুর ইউনিয়নে ১টি পরিবার, বারইয়ার ঢালা ইউনিয়নের মহালংকা গ্রামে ২৩টি পরিবার, বহরপুরে ৮০টি পরিবার, বাড়ইপাড়ায় ৩৪০টি পরিবার ও নারায়ণ মন্দির, বাশঁবাড়িয়ায় ১২টি পরিবার বাড়বকুণ্ডে ১৭টি পরিবার ও ২টি মন্দির এবং ফরহাদপুরে ১৪টি পরিবার হামলার শিকার হয়েছে। লুটপাটের পর এসব বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। হাটহাজারী থানার মেঘলায় ১টি মন্দির ও একটি পরিবার, ধলইয়ে ৩টি মন্দির ও ১০টি পরিবার, শিকারপুরে ১টি পরিবার এবং চারিয়ায় ৪টি মন্দির ও ৩২টি পরিবারের উপর হামলা করা হয়েছে। এসব বাড়িঘর ও মন্দির লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। রাউজান থানায় হলদিয়া ইউনিয়নে ১টি মন্দির, ডাবুয়ায় ৮টি বাড়ি ও ৩টি মন্দির, চিকদাইরে ১২টি বাড়ি ও ৩টি মন্দির, রাউজান সদরে ১টি মন্দির, গুজরায় ২টি মন্দির, কদলুরে ২টি মন্দির, পাহাড়তলীতে ৩টি পরিবার ও ১টি মন্দির, উরকিরচরে ২টি মন্দির, পশ্চিম গুজরায় ১টি মন্দিরে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। ফটিকছড়ি থানায় কর্ণফুলি চা

বাগানে ১৪টি পরিবার, দাঁতমারা ইউনিয়নে ২টি মন্দির সুন্দরপুরে ৩টি পরিবার, ১টি মন্দির পাইনদরে ৩টি পরিবার কাঞ্চনপুরে ২০টি পরিবার, ধুরং এ ২টি মন্দির ও ৯টি পরিবার, লেলাংয়ে ৭৪টি পরিবার, নানুপুরে ৭টি পরিবার, সোয়াবিলে ৬টি মন্দির ২টি পরিবার, রোসাংগিড়ি এলাকায় ৫টি মন্দির এবং রাঙ্গামাটিয়ায় ৩টি পরিবার ও ১টি মন্দিরে মৌলবাদীরা হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। চন্দনাইশ থানার পাঠানদন্ডী গ্রামের বিভাষকান্তি চৌধুরী, বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী ও গৌরাঙ্গমোহন দাশগুপ্তের ৪০/৪৫ কানি জমির ধান ৬টি পুকুর ও ১টি বড়দিঘীর মাছ সম্পূর্ণ রূপে ধরে নিয়ে গিয়েছে ১৭,১৮,১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর মিরাজ বাহিনীর সশস্র সন্ত্রাসীরা। তারা ২০শে সেপ্টেম্বর পুলিশের সম্মুখে বিভাষ কান্তি চৌধুরীকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।

কক্সবাজার সদরের খুরুস্কুল ইউনিয়নে সেকাখোলার মন্দির ও চিতাখোলাস্থ মন্দির ভেঙ্গে ফেলে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। জালালাবাদ ইউনিয়নে ঈদগা বাজারস্থ কেন্দ্রীয় কালী মন্দির, হিন্দু পাড়াস্থ সর্বজনীন দুর্গামন্দির, মাছুয়াপাড়ার মনসা মন্দির, হরিমন্দির, বোয়ালখালিস্থ দুর্গামন্দির, অদ্বৈতচিন্তাহারী মঠ ও মঠসংলগ্ন মঠাধ্যক্ষের বাড়ি এবং আরো ৫টি পারিবারিক মন্দিরে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভুত করা হয়। এই ইউনিয়নের হরি মন্দির লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের ৮টি মন্দির, ৬টি বাড়ি, ২টি দোকান আগুন দিয়ে ভস্মীভুত করে ফেলা হয়। এই ইউনিয়নের ১৬৫টি হিন্দু পরিবারের সর্বস্ব লুট করা হয় এবং বাজারের ৫টি হিন্দু দোকান লুট ও দোকানের হিন্দু মালিকদের মারধোর করে মৌলবাদীরা। উক্ত ইউনিয়নের বিভিন্ন পরিবারের ধানের গোলা ও ধানের স্তূপে কেরোসিন ঢেলে ধান ও ধানের আটি ভস্মীভুত করা হয়। উখিয়া থানার রাজাপালং ইউনিয়নের ভৈরববাড়ি সম্পুর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলা হয়। এই থানার সাবরাং ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় মন্দির ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মহেশখালীর ৩টি মন্দির ১১টি বাড়ি লুণ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাতে। হোয়াক ইউনিয়নের ৪টি গীতাস্কুল ও ১টি বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়। কালারমার ইউনিয়নের কালারমার বাজারের সর্বজনীন কালীমন্দির এবং কালীপাড়াস্থ হরি মন্দির ভাংচুর ও ধ্বংস করা হয়। কুতুবদিয়া থানার বড়ঘোপ বাজার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় কালীমন্দির এবং নাটমন্দিরসহ ৬টি মন্দিরে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বড়ঘোপ বাজারের ৪টি স্বর্ণের দোকানের যাবতীয় মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ৫১টি জেলে পরিবারের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করা হয়, কুতুবদিয়ায় জীবন্ত ৩টি হিন্দু শিশুকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে মৌলবাদীরা। রামু থানার ঈদগড় ইউনিয়নের সর্বজনীন কালীমন্দির ও জেলেপাড়ার হরিমন্দির ভাঙচুর করার পর আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। ফতেখারকুল ইউনিয়নে ৫টি মন্দির ও ৫৪টি বাড়ি লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সিলেটে ৬ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর '৯২ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বিভিন্ন মন্দির, বাড়ি ও ব্যবসা কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে এক লোমহর্ষক ইতিহাসের জন্ম দেয়। সিলেট সদরের কালীঘাট কালীবাড়ি, শিববাড়ি, জগন্নাথ আখড়া, চালিবন্দর বৈরর বাড়ি, চালিবন্দর

শ্মশান ও শ্মশান কালী, যতরপুর মহাপ্রভুর আখড়া, মীরাবাজার রামকৃষ্ণ মিশন, মীরাবাজার বলরামের আখড়া, চালিবন্দর উমেশচন্দ্র নির্মলবাল ছাত্রবাস, বন্দর বাজার ব্রাহ্মমন্দির ও সাহিত্য পরিষদ, জিন্দাবাজার গোবিন্দজীর আখড়া ও জগন্নাথের আখড়া, লামাবাজার নরসিংহের আখড়া, নয়া সড়ক আখড়া, দেবপুর আখড়া, টিলাগড় দুর্গাবাড়ি, বিয়ানী বাজার কালীবাড়ি, ঢাকা দক্ষিণ মহাপ্রভুর বাড়ি, গোটটি কর শিববাড়ি, মহালক্ষী বাড়ি ও মহাপীঠ। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা দুর্গাবাড়ি, বিশ্বনাথে শাজিবাড়ি, বৈরাগীবাজার আখড়া,চন্দ্রগ্রাম শিবমন্দির, আকিলপুর আখড়া, কোম্পানীগঞ্জ জীবনপুর কালীবাড়ি, জকিগঞ্জ আমলসী কালী মন্দির, সুনাসার মন্দির, বারহাটা আখড়া, গাজীপুর আখড়া, বীরশ্রী আখড়াসহ প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি হামলা করে। ভাঙচুর লুটপাটের পর এসব মন্দির ও আখড়ায় আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। এছাড়াও বিভিন্ন হিন্দু বাড়িতে হামলা করা হয়েছে। হামলার সময় বেণুভূষণ দাস, সুনীলকুমার দাস, কানুভূষণ দাস প্রমুখ ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। ৯ ডিসেম্বর দুপুরে হবিগঞ্জের মাধবপুর থানা সদরে মৌলবাদীরা মিছিল সহযোগে ৩টি মন্দির আক্রমণ করে। পুলিশ বাধা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ঘটনাস্থলে বি ডি আর এসে গুলিবর্ষণ করে। ফলে ২জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। বি ডি আর মোট ৬১ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। ডি.সি. এসপি ঘটনাস্থলে পৌছার পর বি ডি আর প্রত্যাহার এবং গুলীবর্ষণের আদেশদানকারী এ, সি ল্যান্ডকে সাসপেন্ড করা হয়। এরপর উচ্ছৃঙ্খল জনতা হামলা করে বাজারের কালী মন্দির ও নোয়াগাঁও গ্রামের স্মৃতি মন্দির। তারা এই মন্দির দু'টিকে ধ্বংস করে ফেলে। ১০ ডিসেম্বর সকালে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার তপনকুমার দাশগুপ্তের চেম্বারে হামলা করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। মৌলভীবাজারে ৮, ৯, ১০ ডিসেম্বর এই তিনদিন হামলা করা হয় রাজনগর ও কুলাউড়া থানায়, এই দু'টি থানায় ৬টি মন্দির ও আখড়া ভাঙচুর,লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। উক্ত এলাকায় ৭টি হিন্দু দোকান লুট করা হয়। সুনামগঞ্জ চৌমোহনায় 'খুদ্দামুদ্দিন' নাামের একটি উগ্রবাদী সংগঠন সমাবেশ করে ৯ ডিসেম্বর। সমাবেশ শেষে তারা মিছিল সহযোগে ৪টি মন্দির ও ৫০টি দোকানে হামলা, লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। মৌলবাদীরা হিন্দু বাড়িতে বোমাও নিক্ষেপ করে।

কুমিল্লায় ৭ ডিসেম্বর '৯২ মধ্যরাতে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অভয় আশ্রমের একটি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করে ছাত্রাবাসটি ভস্মীভূত করে ফেলে। ৮ ডিসেম্বর সকালে লালমাই পাহাড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন চণ্ডীমুড়া মন্দিরে হামলা করে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়, লাকসামের কদমতলীতে ২টি, উত্তদায় ২টি মন্দির, বরুড়া থানার সিংহল মন্দির, চৌদ্দগ্রাম থানার পদুয়া বাজারের কালীমন্দির ভাংচুর করা হয়। শুভপুর গ্রামের জেলে পাড়ায় ১২টি বাড়িতে লুটপাট করা হয়। ঋষিপাড়ায় ভাঙচুর ও লুট করা হয়। কাশারিয়াপট্টি ও চকবাজারে মন্দির ও ব্যবসা কেন্দ্রে হামলা করা হয়। টিক্কারচর শ্মশানে ভাঙচুর করা হয়। একই দিন সকালে কুমিল্লা শহরে হিন্দুদের ৩০টি বাড়ি, ২০টি দোকান ভাঙচুর ও লুট করা হয়।

লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার টাঙ্গির বাজারে ১টি দোকানে অগ্নিসংযোগ, ২টি মন্দির ভাঙচুর এবং সদর থানার ভবানীগঞ্জ ও দিঘলীতে মন্দির আক্রমণ করা হয় ৮ ও ৯ ডিসেম্বর। মান্দারী বাজারের রামঠাকুর সেবাশ্রম ভাংচুর, রামগঞ্জের রতনপুর মন্দিরে হামলা, দাশকপুর ইউনিয়নের নন্দী গ্রামে ৪টি মন্দির ধ্বংস লক্ষীপুর সদরে বিরাহিমপুর গ্রামে ৩টি মন্দির ও ঘরবাড়ি, পার্বতীনগরে ১টি কালীমন্দির, ভাংগাতা ইউনিয়নে ২টি মন্দির, চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের দেওপাড়া, বসু দুহিতা ও ধন্যপুর গ্রামে কয়েকটি মন্দির, পাঁচপাড়া গ্রামে কালীমন্দির এবং কামারহাটে ৩টি মন্দির, ভাঙচুর লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। লক্ষীপুর সদর থানার দত্তপাড়া বাজার মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মন্দির সংলগ্ন দীঘির মাছ লুট করে নিয়ে যায়। পৌর এলাকায় শাঁখারীপাড়া মন্দিরে হামলা করা হয়। ৮ ডিসেম্বর ফেনীর সহদেবপুর গ্রামে মিছিল করে একদল মৌলবাদী ১৩ টি বাড়িতে হামলা করে। ১০ ডিসেম্বর ছাগলনাইয়া থানার জয়পুর গ্রামে জনৈক মোয়াজ্জেম হোসেন নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ২০০ লোক গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বাসায় হামলা করে। ১১ ডিসেম্বর চাঁদপুর পুরান বাজার এলাকায় একটি মন্দিরে হামলা করা হয়।

ফেনী জেলার পরশুরাম থানার বসন্তপুর গ্রামের শ্রীশ্রী আদি রাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রম মন্দিরে দুস্কৃতিকারীরা হামলা করে ২০ জুন। দুর্বৃত্তরা মন্দিরের রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ ভেঙ্গে ভুলূণ্ঠিত করে দেয়।

নওগাঁ জেলার মান্দা থানার পারশিমলা গ্রামের শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে ১ মার্চ অনধিকার প্রবেশ করে তারিফুন বিবি, তনিছা বিবি, সুন্দর বিবি,মোঃ খায়ের আলী, পাইকাম্বর মন্ডল,ইসরাইল তালুকদার। এরা মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদককে লাঞ্জিত করে এবং মন্দির প্রাঙ্গণের চারা গাছগুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ইতিপূর্বে এই দলটি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন করেছে এবং হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাবার হুমকি দিয়েছে।

রাজশাহী জেলার বাঘা থানার শ্রীশ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন ক্ষ্যাপা বাবার আশ্রমে ৭ ডিসেম্বর বাঘা থানার জামাতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক আবদুল মোতালেব মোল্লার নেতৃত্বে দুই শতাধিক মৌলবাদী হামলা চালায়। তারা আশ্রমের সোনার মুর্তি, সোনার অলংকার ও নগদ টাকাসহ যাবতীয় মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এরপর উক্ত মৌলবাদী দল বিস্ফোরক পাউডার ও পেট্রোল ব্যবহার করে আশ্রমটি ভস্মীভুত করে দেয়। আশ্রমের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা।

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার আমীরখানী গ্রামের জয়কালী মন্দির প্রাঙ্গণস্থ বিভিন্ন মন্দির ও আশ্রমে হামলা চালানো হয়েছে ৮ ডিসেম্বর। প্রায় ১৫০ জন দুষ্কৃতিকারীর একটি সংঘবদ্ধদল জয়কালী বাড়ীস্থ মন্দির ও আশ্রমে হামলা করে কালী মূর্তি ভাঙচুর করে, কালী মূর্তির মুল্যবান অলংকার, মন্দিরের দরজা, পূজার যাবতীয় সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। লুটের পরে তারা মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিলে মন্দির ও আশ্রম ভস্মিভুত হয়ে যায়। একই

সাথে তারা শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গ ভেঙ্গে ফেলে এবং শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ স্বামীর মন্দির ও নাট মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

৮ আগস্ট ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু থানার চাঁদপুর ইউনিয়নের বভুতাদড়া গ্রামের দাস পাড়ায় এবং শৈলকুপা থানার কুলচারা গ্রামের রেজাউল ওরফে রেজার নেতৃত্বে ৩০/৪১ জনের এক সন্ত্রাসী দল রামদা, চাইনিজ কুড়াল, কাটারাইফেল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অতর্কিতে নবদ্বীপ দাসসহ অন্যান্যদের বাড়িতে হামলা চালায়, সন্ত্রাসীরা সত্তর বছরের বৃদ্ধ নবদ্বীপ দাসকে পার্শ্ববর্তী ডোবায় চুবানি দেয়। গজেন্দ্রের স্ত্রী মমতা ও সুশীলের স্ত্রী দুর্গারাণীকে বিবস্ত্র করে ফেলে এবং লঙ্কেশ্বরের স্ত্রী জোৎস্না রাণীকে মারপিট করে ও তার ভাতের হাঁড়ি লাথি মেরে ফেলে দেয়। যাবার সময় দুর্বৃত্তরা গৃহপালিত পশু এবং আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

নোয়াখালীর সাধুরাম থানার সুন্দলপুর ইউনিয়নে ৭ ডিসেম্বর অধরচাঁদ আশ্রম এবং ৭টি বাড়ি লুটপাট, লুটপাটের পর ভস্মীভুত করা হয়। জগদানন্দ গ্রামের ৩টি বাড়ি লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর গঙ্গাপুর গ্রামে ৩টি বাড়িতে আগুন দিয়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভুত করা হয়। ১২ ডিসেম্বর রাগরগাও গ্রামে ১টি বাড়িতে আগুন দেয়া হয়। নেওয়াজপুর ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামে দুইটি বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সোনারপুর সর্বজনীন মহাশ্মশানের শিবকালী মন্দির ধ্বংস এবং বিনোদপুর আখড়ায় হামলা চালানো হয়। তাছাড়া এসব এলাকায় অনেক বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়। অনেকের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। বেগমগঞ্জ থানার চৌমুহনী পৌরভবনের উত্তর পাশের কালীমন্দির, দুর্গাপুর গ্রামের বণিক বাড়ির সম্মুখের মন্দির, কুতুবপুর গ্রামের একটি মন্দির এবং গোপালপুরে মন্দির ভাঙচুর বিগ্রহ ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ৮ ডিসেম্বর রাতে সুলতানপুর গ্রামের ডাঃ আর, কে সিংহের ঔষধের কারখানা, অখণ্ড আশ্রম, রমনীরহাট সংলগ্ন পুকুরের পাকাঘাট ও মঠ লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ছয়ানী বাজার এলাকায় মন্দির ভাঙচুর করা হয়। সোথাপারা গ্রামে কেশবচন্দ্র কুরীর বসতবাড়ি ভস্মীভুত এবং বাজারের অনেকগুলি দোকান লুট করা হয়। মহদিপুরে একজন মহিলাকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। বাবুপুর কাজীরহাট, রসুলপুর জমিদারহাট, চৌমুহনী পোড়াবাড়ি ও ভবভদ্রী গ্রামে ৮ ও ৯ ডিসেম্বর এই দু'ইদিনে ১০টি মন্দির, ১৮টি বাড়ি, ১টি দোকান ও ১টি গাড়ি ভাঙচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। কোম্পানীগঞ্জ থানার বড়রাজপুর গ্রামে ৭ ডিসেম্বর ১৯টি বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এবং মহিলাদের নির্যাতন করা হয়। ৭ ডিসেম্বর রাতে রামদি গ্রামে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এবং ১২ ডিসেম্বর বিপ্লব ভৌমিককে দা দিয়ে কোপানো হয়, একইদিন বিরাহিমপুরে মন্দির এবং বাড়ি লুট ও ভাঙচুর করে মৌলবাদীরা। সিরাদপুরে প্রতিটি হিন্দু পরিবারে নির্যাতন, লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সেনবাগ থানায় ৭ ডিসেম্বর কল্যাণদি হিন্দু মিশন মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। ১১ ডিসেম্বর ঠাকুরবাড়ি মন্দিরে আক্রমণ করা হয়, নলদিয়ায় শীতলা মন্দির ও মন্ডল বাড়ির

শীতলা মন্দির ভাংচুর করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর বড়বারিগাও গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। ছাতরা পাইয়া বাজার কালীমন্দির ও বীর কোর্ট ঠাকুরবাড়ি ভাঙচুর এবং জামালপুরে সুনীল দাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। চাটখীল থানার সাহাপুর গ্রামে সনাতন হরিসভা মন্দির ভাঙচুর করা হয়, এখানে ৩টি মূল্যবান সিংহাসন ও বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়, মন্দিরের অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় মৌলবাদীরা, তারা মন্দির সংলগ্ন তিনটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

শিবরামপুর ও রঘুনাথপুরে মন্দির ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ করা হয়। সোমপাড়া বাজারে ১০ ডিসেম্বর কেশবচন্দ্রের সোনার দোকান ও বাড়ি লুট করা হয়। শীতলা মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়, মাতৃভাণ্ডার নামে একটি দোকান, রবি মাস্টারের বাড়ি ভাঙচুর ও লুট করা হয়। এসব বাড়ির পারিবারিক মন্দির ও বিগ্রহ বিনষ্ট করে ফেলে।

ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন ও বোরহানউদ্দিন থানার হিন্দু অধ্যুষিত ছোট তাউরী, গোলকপুর, শম্ভুপুর দাসের হাট, খাসের হাট, দরিরামপুর, পদ্মাসন ও মনিরাম গ্রামের ১০ হাজার পরিবারের প্রায় ৫০ হাজার হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করেছে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। এসব এলাকায় ৭ ডিসেম্বর থেকে ব্যাপক লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন চালানো শুরু হয়। এখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫০ কোটি টাকারও বেশী। হামলায় দুইজন নিহত ও ২০০ জন আহত হয়েছে। তাদের পরিধানের কাপড় নেই, শিশুরা ক্ষুধায় কাতর, মহিলাদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। গ্রামগুলির সব বসতবাড়ি ভস্মীভুত। দোকানপাট লুট হয়েছে শত শত। দাসের হাট বাজারে কোন হিন্দুর দোকান লুটের থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। পুরো এলাকাটি দৃশ্যতঃ ধ্বংসপুরীতে পরিণত করা হয়েছে। চাঁদপুর ইউনিয়নের প্রকাশ মহাজন বাড়ির ৪৫ বছর বয়স্ক এক অপহৃতা মহিলাকে চারদিন পর ১১ ডিসেম্বর একটি বেতের ঝোপ থেকে উদ্ধার করা হয়। ভোলা শহরে মদনমোহন ঠাকুরের বাড়ি ও মন্দির, লক্ষ্মীগোবিন্দ ঠাকুর বাড়ি ও মন্দির, কালীবাড়ি মন্দির এবং মহাপ্রভুর আখড়ায় অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করা হয় ৮ ডিসেম্বর। একইদিন এবং তার আগের দিনের হামলায় পর দৌলত খান, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, তজুমুদ্দিন ও লালমোহন থানায় কোন মন্দিরের অস্তিত্ব রাখেনি মৌলবাদীরা। কোন আখড়া বা উপাসনালয়েরও চিহ্ন রাখা হয়নি। ভোলা শহর থেকে দুই মাইল দুরে ঘুইন্যার এলাকায় দু মাইল জুড়ে হিন্দুদের ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। দৌলতখান থানার সুপ্তবাজারে বৃহৎ আখড়াটি ৭ ডিসেম্বর রাতে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ৮ ডিসেম্বর সকালে বোরহানউদ্দিন বাজারের প্রধান আখড়াটি ভাঙচুর এবং পরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বোরহানউদ্দিন থানার কুতুবা গ্রামে ৫০টি বাড়ি ভস্মীভূত করা হয়। চরফ্যাশন থানার হিন্দুদের বাড়িঘরে ব্যাপক হামলা ও লুটতরাজ চালানো হয়। ভোলা সদরে অরবিন্দ নামে একজন ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। ১০ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে ১২ ঘন্টার জন্যে কার্ফু শিথিল করা হলে, এই সময় প্রায় তিনশ লোক শাবল, কুড়াল নিয়ে ভাগ্যলক্ষীনারায়ণের আখড়ায় তৃতীয়বারের মতো হামলা চালায়। ভোলার জেলা প্রশাসকের উদ্ধৃতি দিয়ে 'পরিষদ বার্তা (১১ জানুয়ারী '৯৩)

লিখেছে "জেলা প্রশাসক জানান, 'হাজার হাজার বাড়ি লুট হয়েছে, কয়েক হাজার বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে।" তাছাড়া হিন্দুদের জমি থেকে ধান লুট করেছে উল্লেখিত এলাকার প্রায় সর্বত্র।

ভোলা জেলায় এই সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মোটামুটি এ রকম –বোরহানউদ্দিনে ১৫৬১ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত এবং দুই হাজার ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তজুমুদ্দিন থানায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা ২ হাজার ২শ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ২ হাজার। লালমোহনে ৩০০ ঘরবাড়ির সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং ৫০০ টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চরফ্যাশনে ৫০টি ঘরবাড়ি সম্পুর্ণ ধ্বংস এবং ২০০ বাড়ি আংশিক ক্ষতি করা হয়েছে। ভোলা জেলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত সর্বজনীন মন্দিরের সংখ্যা ২৬০টি। পুলিশের ভুমিকা সম্পর্কে উপরোক্ত পত্রিকার একই সংখ্যায় লিখেছে, 'ভোলা শহর ও অন্যান্য স্থানে মন্দির ও বাড়িঘর লুটপাটের সময় এবং আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার সময় ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ বাহিনী রহস্যজনক ভাবে নিস্ক্রিয় থাকে'। অপরদিকে বরিশালের স্বরূপকাঠি থানার ধলহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সমীরণ বিশ্বাসকে ২০ জুন গুলি করে হত্যা করা হয়। সাতক্ষীরা শহরে ৭ ডিসেম্বর রাতে শিব মন্দির এবং কালীগঞ্জ থানার সাতালী মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। নুর নগরে একটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়।

বরিশাল জেলার বাউফল থানার কনকদিয়া ও কাহিপাড়া গ্রামে ২টি মন্দির ভস্মীভূত করা হয়। বরগুনা শহরে সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভুর বাড়িতে মৌলবাদীরা হামলা করে। শহরের ৪/৫টি মিষ্টির দোকান লুট করা হয়। উজিরপুরে ধমুড়ার মন্দিরে হামলা করা হয়। রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের ছাত্রাবাসে হিন্দু ছাত্রদের কক্ষে হামলা করা হয়। রাতে বিভিন্ন হিন্দু বাড়িতে হামলা করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। ১৪ ডিসেম্বর উজিরপুর থানার দত্তেশ্বর গ্রামে একদল লোক ২টি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, ১টি মন্দির ভাঙচুর এবং ১টি বাড়ির মালপত্র লুট করে। নরপশুদের আক্রমণকালে ৩৪টি বাড়ির লোকজন পালিয়ে যায় এবং একজন বৃদ্ধা পালাতে ব্যর্থ হলে দুর্বৃত্তদের হাতে প্রহৃত হন। একই দিন সন্ধ্যায় বরিশাল শ্মশানঘাটে একটি মৃতদেহ দাহ করার সময় কতিপয় লোক এসে বাধা দেয় এবং তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। এরপর তারা শবদেহ সৎকারের আগে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না পেয়ে তারা তিনটি বৈদ্যুতিক চার্জার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বরিশালের শ্মশান কালী মন্দির বাজারের হরি মন্দির, দক্ষিণ ঝাউপুর, বাকেরগঞ্জ হিজলী, মেহেন্দিগঞ্জের সব মন্দির পুড়িয়ে ফেলা হয়, চরকদিয়া ইউনিয়নের গোকুলনাথের বাড়ির কালী মন্দির, হরিপদনাথের সমাধি মন্দির এবং প্রফুল্লকুমার পালের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। গোবিন্দপুর ইউনিয়নের বাসুদেব মন্দিরও ভাঙচুর করা হয়। ঝালকাঠি জেলায় ৭ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে তাণ্ডবলীলা। সদর থানার পোলাবালিয়াতে শিবমন্দিরসহ ২টি মন্দির, বেড় লোচাগ্রামে ১টি, নলছিটি থানা সদরে ১টি এবং রাজাপুর

থানা সদরে ১টি মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়। ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গৌরনদী থানার বার্থী মন্দিরে হামলা করে কয়েকশ মৌলবাদী।

পটুয়াখালি জেলার বাউফল থানার চাঁদকাঠি, কেশবপুর ও গুসিয়া নামক স্থানে ৫টি মন্দিরে হামলা করা হয়। এই হামলা করার সময় পুলিশ চারজন হামলাকারীকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসের ৩৮বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাই মনিরুজ্জামানও রয়েছে। ছুটিতে আসা এই সিপাইর নম্বর ৪০০২৫৪৩। ৯ ডিসেম্বর বাউফল ও কলাপাড়া থানায় ৭ টি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর ও লুট করা হয়।

খুলনা জেলার ৩টি থানায় ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ১০টি মন্দির ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়, হামলাকারীরা অনেক হিন্দু বাড়িতেও আক্রমণ করে এবং দুর্বৃত্তদের হামলায় রুপসা থানায় একজন হিন্দু যুবক মারাত্মক ভাবে আহত হয়। মাগুরা জেলায় হামলা করা হয় ৭ ও ৮ ডিসেম্বর। সদর থানার আলাইপুর রামচন্দ্র, বরই গ্রামে এবং মোহম্মদপুর থানার কাঠাল বাড়িয়া গ্রামে কয়েকটি পূজামণ্ডপে হামলা করা হয়। তাছাড়া শহরের বাটিকাডাঙ্গায় ১টি মন্দিরেও হামলা করা হয়। ৮ ডিসেম্বর বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানার কাকঘিরা বাজারের পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মধুসূদনকে মৌলবাদীরা বেদম প্রহার করে মারাত্মকভাবে আহত করে।

সিরাজগঞ্জ শহরের সোহরাওয়ার্দী সড়কের সপ্তর্ষি সংসদের কালীমন্দির, বাহির গোলার কালীমন্দির এবং আরো দু'টি মন্দিরে হামলা করে ছাত্র শিবির ও যুব কমাণ্ডের সন্ত্রাসীরা। ১১ ডিসেম্বর জেলা ইমাম সমিতির নেতৃত্বে শহরের ১টি আখড়াসহ কালীমন্দির, প্রায় ১৫টি ব্যবসা কেন্দ্র ও বাড়িতে হামলা এবং লুটপাট করে। এদের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর কর্মীরা ছিল। সন্ধ্যায় ঘোষপাড়ায় ১টি মন্দির ভাঙচুর করা হয়, ইমাম সমিতি ও জামাতে ইসলামী এক পর্যায়ে যৌথ কর্মসুচী ঘোষণা করলে ভয়ে শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ১০ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলায় ৪০টি মন্দির ভাঙচুর করা হয়। ১১ ডিসেম্বর গভীর রাতে সিরাজগঞ্জ শহরের গুরখা পৌর শ্মশান ঘাটের মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে এবং লোহার দরজা জানালা লুট করে নিয়ে যায়। পাবনার শালগড়িয়া অনুকূলে ঠাকুরের আশ্রমের ভদ্রকালী মন্দির এবং রাধানগরের ২টি কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। লক্ষী মিষ্টান্ন ভান্ডারসহ ১৫টি দোকানেও আগুন লাগানো হয়। ৮ ডিসেম্বর দুপুরে কালাচান্দ পাড়া মন্দিরে হামলা করা হয়, ঐদিন বিকালে জামাতে ইসলামীর মিছিল থেকে সাঁথিয়া কালীমন্দির, পদ্রবিলা কালীমন্দির, চেকনিয়া কালীমন্দির ও কালঘর কালীমন্দিরে হামলা করে জামাতে ইসলামীর একটি মিছিল। এই মিছিলটি ৩টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং বাজারের ২টি দোকান ভাঙচুর করে। ঈশ্বরদী থানার দান্তরিয়ায় একটি কালীমন্দিরে হামলা করে ক্ষতি সাধন করা হয়।

৭ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ায় জামাত শিবির কর্মীরা ৬টি মন্দির ভাঙচুর করে মিছিল সহযোগে। ১১ ডিসেম্বর প্রায় পাঁচ হাজার মৌলবাদী পুলিশ ও বি ডি আর বেষ্টনী ভেদ করে

কুষ্টিয়া বাজারের শ্মশানে হামলা করে। শ্মশনের কালীমন্দির, শিবমন্দির ও দুর্গামন্দির ভেঙ্গে ফেলে এবং পরে গোটা শ্মশানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নাটোরের জামে মসজিদের সম্মুখে ৮ ডিসেম্বর সমাবেশের পর মৌলবাদীরা কানাইখালী মহল্লায় ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে, এতে ২০টি বাড়ির ক্ষতি হয়। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর বাজার মন্দির ও মঠপাড়ার মন্দিরসহ ৭টি মন্দির ভাঙচুর করে এবং পুড়িয়ে দেয়, ঠাকুরগাঁও জেলার রাণী সংকৈল থানার হোসেন গায়ের একটি পূজামণ্ডপ, পীরগঞ্জ থানার দেওহাট পুজামণ্ডপ সদর থানার ধুল্লী ও বালিয়া পুজামণ্ডপসহ জেলার মোট নয়টি এলাকার সবগুলো পুজামণ্ডপে, অগ্নিসংযোগ করে। বগুড়া শহরে কালীতলা হাট কালী মন্দিরসহ মোট পাঁচটি মন্দির ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। নওগাঁ শহরের মন্ডল পাড়ার পূজামণ্ডপে তিনটি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়।

দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ সৎসঙ্গ বিহার, এনায়েতপুর কালী মন্দির ও বিগ্রহ কাঞ্চন ঘাট সাধু আশ্রম, ফুলতলা শ্মশান ঘাট কালী মন্দির, আনন্দসাগর শিবমন্দির, নিমনডার কলুবাড়ি কালীমন্দির ও বিগ্রহ, থানাসংলগ্ন জয়কালী মন্দির, গণেশতলা কালী মন্দির ও গণেশ মন্দির নিমতলা রাধাকৃষ্ণ মন্দির, গরুহাটি মনসা মন্দির ও শনি মন্দিরসহ ষোলটি মন্দিরে লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১১ ডিসেম্বর জাতীয় ইমাম সমিতি মিছিল সহকারে শহরের শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুট ও ভাঙচুর করে। স্থানীয় সচেতন অধিবাসীদের অভিযোগ বিভিন্ন মন্দিরে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও হামলার সময় পুলিশ নীরব ভুমিকা পালন করে। দিনাজপুরের বাহাদুর বাজার, পাবনা সুইট, বগুড়া সুইট, থানা সংলগ্ন অজিত ঘোষ সুইটমিট, মা মিষ্টান্ন ভান্ডার ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়, শহরের মালহ পট্টির রমেশ বস্ত্রালয়, সন্তোষ বস্ত্রালয়, দিলীপ বস্ত্রালয়, জয় বস্ত্রালয়, ফ্রেন্ডস ক্লথ ষ্টোরসহ বহু দোকান লুট এবং ভাঙচুর করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। রংপুর আলমনগর স্টেশনে কালী মন্দির, কতোয়ালী থানার তাথকাটে অভয় আশ্রম, অভিরামে সন্ন্যাসী মন্দির, বুড়ির হাটের কালীমন্দিরে লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মহিগঞ্জেও চালানো হয় অনুরূপ হামলা।

তাছাড়া নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও পিরোজপুরের হিন্দু সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হিংস্র থাবায় আক্রান্ত হয়। নড়াইলের সদর থানার রতনডাঙ্গা গ্রামে সর্বজনীন মন্দির, ঘোনা সর্বজনীন মন্দির, কুড়লিয়া গ্রামে সর্বজনীন শ্মশান ঘাট মন্দির, নিখিলচন্দ্র দে'র পারিবারিক মন্দির, শিবপ্রসাদ পালের পারিবারিক মন্দির, বাদন গ্রামের দুলালচন্দ্র চক্রবর্তীর পারিবারিক মন্দির , কৃষ্ণচন্দ্র লস্করের বাড়ির মন্দির, তালতলা গ্রামের সর্বজনীন মন্দির পঙ্কবিলা গ্রামের বৈদ্যনাথ সাহা মন্দির, সুকুমার বিশ্বাসের পারিবারিক মন্দির, পঙ্কবিলা গ্রামের সর্বজনীন মন্দির ও লোহাগড়া থানার দৌলতপুর পূর্বপাড়া নারায়ণ জিউ মন্দিরে হামলা চালানো হয়। মৌলবাদীরা এসব এলাকায় লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সরাইল থানার কালীকচ্ছ গ্রামে ৭ ডিসেম্বর আনন্দজয় দুর্গা সমাধি মন্দির, সৌদামিনী সমাধি মন্দির, বাসুদেব মন্দির ও বিগ্রহ, রক্ষাকালী মন্দির ও

কালী বিগ্রহ রাধাগোবিন্দ মন্দির ও বিগ্রহ শ্মশান কালী মন্দির ও বিগ্রহ, ঝুলন মন্দির, শম্ভু সাহার মন্দির ও বিগ্রহ, পার্শ্ববতী গ্রামের বাড্ডা পাড়ার শ্মশান স্মৃতিসৌধ, ভজনকুমার পালের বাড়ি, সদর থানার সুহীলপুর গ্রামের শিববাড়িতে লুট ও অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে ফেলা হয়। এছাড়াও শহরের সীমরাইলকান্দি শ্মশান ও নবীনগরে দুইটি মন্দিরে হামলা ও লুটপাট করা হয়। চুমটা গ্রামে একটি মন্দির অরুয়াইল গ্রামের আখড়া বাড়ি এবং মন্দির ভাঙচুর লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

পিরোজপুর সদর থানায় কালী বাড়ির দেবার্চনা কালী মন্দির, মনসা মন্দির, দুর্গামন্দির, শীতলা মন্দির, শিবমন্দির, নারায়ণ মন্দির, পিরোজপুর মদনমোহন বিগ্রহের মন্দির, আখড়া মন্দির, রায়ের কাঠি কালীবাড়ি মন্দির , কৃষ্ণনগর রাইর সরাজ সেবাশ্রম ও মন্দির, দক্ষিণ ডুমুর তলায় সুরেশ সাহার বাড়ির কালীমন্দির, ডুমুর তলা শ্রীগুরুসংঘের আশ্রম ও মন্দির, ডুমুর তলার রমেশ সাহা এবং নরেন সাহার বাড়ির মনসা মন্দির ও বসত বাড়ি, ডুমুরতলা বারোয়ারী কালীমন্দির, সুচরণ মণ্ডল, গৌরাঙ্গ হালদার, হরেন্দ্রনাথ সাহা ও নরেন্দ্রনাথ সাহার পারিবারিক মন্দির, ডুমুরতলা হাইস্কুল সংলগ্ন কালীমন্দির, রাণীপুর পঞ্চদেবীর মন্দির, হুলারহাট সার্বজনীন দুর্গামন্দির ও কার্তিক দাসের কাঠের দোকান,কলাখালী সনাতন আশ্রমের কালীমন্দির, জুজখোলা গৌরগোবিন্দ সেবাশ্রম, হরি সভার সনাতন ধর্ম মন্দির, রণজিৎ শীলের বাড়ির পারিবারিক মন্দির, জুজখোলা বারোয়ারী পূজামণ্ডপ, গাবতলা স্কুল সংলগ্ন সর্বজনীন দুর্গামন্দির, কৃষ্ণনগর বিপিন হালদারের বাড়ির মন্দির,নামাজপুর সর্বজনীন কালীমন্দির, মাইটভাঙ্গায় নারায়ণ হালদারের পারিবারিক মন্দির, কালীকাঠি বিশ্বাসের বাড়ির দুর্গামন্দির, হেমন্ত শীলের বাড়ির মন্দির, মঠবাড়িয়া থানার ধানী সাকা ইউনিয়নের যাদব দাসের বাড়ির কালীমন্দির, গুলিসা খালী সর্বজনীন হরিমন্দির, নাজিরপুর থানার পাতিলাখালী সর্বজনীন দুর্গামন্দিরে এবং শাখারী কাঠি সর্বজনীন সেবাশ্রমসহ এই জেলার আরো অনেক মন্দির, বিগ্রহ বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মৌলবাদীরা লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ধ্বংস করে। তাছাড়া কৃষ্ণনগর রাইসরাজ সেবাশ্রমের সাধক অধ্যক্ষ জগদানন্দ ঠাকুরকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে।

। ১৯৯৩ ।

১৯৯৩ সালের দু'টি ঘটনা দেশে বিদেশে আলোড়ন তুলেছিল। মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে নাড়া দিয়েছিল।

হিন্দু ধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিল বের করা হয়। ১০ আগস্টের এই মিছিলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু নারী পুরুষ ও শিশু অংশ নেয়। ঢাকেশ্বরী মন্দির মেলাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে গুলিস্তান অতিক্রম করে নবাবপুরের দিকে যাওয়ার পথে এই মিছিলে হামলা করা হয়। হামলাকারীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি ধ্বংস করে রাজপথে মিশিয়ে ফেলে। শিশু ও নারীসহ শতাধিক

ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক আঘাতে জখম করে। মুহূর্তের মধ্যে হিন্দুপ্রধান শাঁখারী বাজার, তাঁতীবাজার, বাংলাবাজার এলাকায় এই হামলা ছড়িয়ে পড়ে। হামলার পুরো ঘটনাটি ঘটে পুলিশের উপস্থিতিতে। পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মিছিলকারীদের বেদম মারপিট করে এবং টিয়ার গ্যাস ছুড়ে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এই হামলার প্রতিবাদে পরে বিভিন্ন স্থানে যেসব বিক্ষোভ মিছিল হয় পুলিশ সে সব বিক্ষোভ মিছিলেও লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ঢাকার রমনা এলাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটের কাছে অনুরূপ একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌদ্দজন হিন্দু ছাত্রকে গ্রেফতার করে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করে। গ্রেফতারকৃত চৌদ্দজন হিন্দু ছাত্র হচ্ছেন - অদ্বৈতকুমার রায় পরিতোষ, সংস্কৃত সম্মান, তৃতীয় বর্ষ। দেবাশীষ হালদার, রসায়ন সম্মান, দ্বিতীয় বর্ষ। পরিমল ভৌমিক, এম এস, এস, অর্থনীতি। শংকরশেখর বেপারী, সংস্কৃত সম্মান, তৃতীয় বর্ষ। প্রবীর রায়, গণিত সম্মান, দ্বিতীয় বর্ষ। তাপস হালদার, চারুকলা, তৃতীয় বর্ষ। চন্দ্রমোহন হালদার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তৃতীয় বর্ষ। চিন্ময় রায়, সংস্কৃত সম্মান, প্রথম বর্ষ। মৃণাল বিশ্বাস, অর্থনীতি সম্মান, প্রথম বর্ষ। সন্তোষ কুমার, প্রাণীবিদ্যা সম্মান, প্রথম বর্ষ। দেবাশীষ ভট্রাচার্য, আইন সম্মান, প্রথম বর্ষ। সুভাষ বড়াল, প্রথম পর্ব, পরিসংখ্যান। মানিকচন্দ্র দাস, ক্যান্টিন বয়, জগন্নাথ হল। বিমল অধিকারী, অতিথি, জগন্নাথ হল। এছাড়া পুলিশী হামলায় শতাধিক কৃষ্ণভক্ত আহত হন।

জন্মাষ্টমীর মিছিলে এই হামলা ও সারাদেশে সাম্প্রদায়িকতার দ্রুত বিস্তার ও বিরাজিত সাম্প্রদায়িকতার ক্রমাবনতিশীলতার প্রতিবাদে সারাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় বছরের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা অনাড়ম্বর ভাবে উদযাপন করেন। উৎসব ও মুর্তি পূজার পরিবর্তে তারা ঘটপূজার মাধ্যমে আড়ম্বরহীনভাবে এই পূজা উদযাপন করে। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হলো না। প্রধানমন্ত্রী পুজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার অফিসে মিটিং করেও এই অচলাবস্থার নিরসন ঘটাতে ব্যর্থ হন।

এই দু'টি ঘটনা ছাড়াও সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে সকল হামলা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার বড় মনোহরিয়া গ্রামের শ্রীশ্রী নিতাই মহাপ্রভুর মন্দির হামলা করে ভাঙচুর ও লুট করেছে উক্ত এলাকার আবদুল মান্নান, সিদ্দিক, মাসুদ প্রমুখ। একই গ্রামের দুর্গামন্দির জ্বালিয়ে দেয়ার পরে পুনরায় নির্মাণ করার কিছুদিন পরেই এই এলাকার হাজী আবদুল মান্নান মন্দিরের জায়গা দখল করার উদ্দেশ্যে তার পোষ্য সন্ত্রাসীদের দ্বারা মন্দির এলাকার আম বেল ও গাব গাছ কেটে নিয়ে যায়, থানায় এ ব্যাপারে ডায়রি করেও কোন ফল হয়নি।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানা পশ্চিম বেতাগী গ্রামে ১৩ আগস্ট একটি বিয়ে-বাড়িতে হামলা করে একজনকে হত্যা করা হয়। উক্ত গ্রামের আশিষচন্দ্র নন্দীর ছোটবোন টকীরানীর বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে রাত সাড়ে তিনটার দিকে ২০/২৫ জনের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদল আশিষ নন্দীর বাড়িতে হামলা করে। তারা বরযাত্রী এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বেঁধে মারধোর করে এবং দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করার সময় দুর্বৃত্তদের কয়েকজনকে চিনে ফেলে চিৎকার দিলে তারা দীপককুমার দেব নামক বাইশ বছরের এই বরযাত্রীকে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। দীপককুমার দেবের বাড়ি রাউজান থানার বাগোয়ান ইউনিয়নের কোয়েপাড়া গ্রামে। এরপর দুর্বৃত্তরা নগদ টাকা স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য সামগ্রী লুট করে ফাঁকা গুলী করতে করতে চলে যায়।

বাড়বকুণ্ড জ্বালামুখী কালীবাড়ির সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি। তারা কালীবাড়ির ছয়টি ঘর দখল করে রেখেছে এবং এইসব ঘরে নানারকম অবৈধ কার্যকলাপ করে আসছে। এদের মধ্যে নাজমুল হুদা চৌধুরী, সালেহ চৌধুরী, জহুর আলম প্রমুখের নেতৃত্বে ০৩.০৮.৯৩ তারিখে প্রায় ৫০০ লোক কালীবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি সর্ম্পূণভাবে দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা করে। মিরসরাই থানার ওয়াজেদপুর ইউনিয়নের খাজুরীয়া সাতবাড়িয়া ও জাফরাবাদ গ্রামের হিন্দুদের কাছে চাঁদা দাবি করছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের আশীর্বাদ পুষ্ট একদল সন্ত্রাসী। তারা দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবী করে। এই পরিমাণ টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা ডাঃ বাবুল দাস, সুভাষ নাথ, ডাঃ নিতাই সাহা, বিনোদবিহারী নাথ, অরুণ নাথ, পুরান ধর, প্রিয়নাথ প্রমুখকে নানারকম অত্যাচার ও শারীরিক আঘাত করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। চাঁদার টাকা দিতে অক্ষম খাজুরীয়া গ্রামের হেরামনি বাবুর পুকুর থেকে জোর পূর্বক মাছ ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে ১৭ মার্চ।

বরিশাল জেলার বানরীপাড়া থানার আলতা গ্রামের মন্মথরঞ্জন হালদারকে ৩ জুলাই বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যাবার তিনদিন পরেও সে বাড়ি ফিরে না আসায় তার পরিবারের সদস্যরা মন্মথরঞ্জনকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকলে ৫ জুলাই তার স্ত্রীর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে একটি খবর আসে। ৯ জুলাই মম্মথ হালদারের স্ত্রী ননদকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকাসহ সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিতে গেলে তারা পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করেই জানায় ঐদিন বিকাল তিনটায় মন্মথরঞ্জনকে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে। এই ঘটনা জানানোর পরেও পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করছে।

১৩ জুলাই উজিরপুর থানার হারতা গ্রামের অনিল রায় ও নিমচন্দ্র হাওলাদার নামক দুই ব্যক্তি বানরীপাড়া থানার তেতলা গ্রামের এক বাড়িতে বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে এলে তাদের দু'জনকে অপহরণ করে গলা কেটে হত্যা করা হয় এবং উদয়কান্তি হাইস্কুলের কাছে তাদের হত্যা করার পরে লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়। স্বরূপকাঠী

থানার ধলহার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক সুকেশ রায়কে ২৬ জুন সকালে স্কুলে কর্মরত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। গৌরনদী থানার উত্তর পশ্চিম চন্দ্রহার গ্রামের রামকৃষ্ণকে তার স্ত্রীর সম্মুখে ঝমঝম ওরফে সিরাজ খাঁ ও মমিন তালুকদার প্রকাশ্যে দিবালোক গুলি করে হত্যা করে এবং এই হত্যাকাণ্ডের পর রামকৃষ্ণের শেষ সম্বল ১.৫০ শতাংশ জমি দখল করার পাঁয়তারা করছে হত্যাকারীরা। উক্ত খুনীদ্বয় এবং তাদের সহযোগীদের ভয়ে রামকৃষ্ণের স্ত্রী ও ছোট ভাই হরেকৃষ্ণসহ পরিবারের অন্যান্যরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রশাসন তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ময়মনসিংহ শহরের ঘেওড়াস্থ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর জগদীশচন্দ্র গুহের পুত্রের নিকট থেকে উইলমূলে বিধবা শ্রীমতী ডলিরাণী কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলেন। বিধবার এই সম্পত্তিই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু গোলাম সাদানী নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি ডলি রাণীর এই সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে তাঁকে নানারকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে। অবশেষে উক্ত গোলাম সাদানী ডলিরাণীর বাড়ির সম্মুখে দেয়াল তুলে তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ফুলবাড়িয়া থানার শিবরামপুর গ্রামের স্বর্গীয় পিয়াসীমোহন দে'র পুত্র চিত্তরঞ্জন গৌরের বাড়িতে একই গ্রামের আবদুস সালাম পিতা ওয়াজেদ আলী ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় প্রবেশ করে তার স্ত্রী মিনতিরাণী দে'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে মিনতির চিৎকারে পাশের বাড়ি থেকে চিত্তরঞ্জন দে ও তার কামলা আঃ রাজ্জাক দৌড়ে এলে আবদুস সালাম চিত্তরঞ্জনের উপর কিরিচ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারাত্মকভাবে চিত্তরঞ্জনকে জখম করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হলেও আবদুস সালামকে মামলা থেকে কর্তৃপক্ষ অব্যাহতি দিয়েছে। মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে আবদুস সালাম বাদী হয়ে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। যার নম্বর এ (৩)/৯৩। চিত্তরঞ্জন পুলিশ ও সালামের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার পুরো পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ভালুকা থানার মেদুয়ারী গ্রামে পয়লা বৈশাখ মেলা চলাকালে ভালুকা থানার দারোগা মঞ্জুরুল হকের নেতৃত্বে বার জন পুলিশ ভিডিপি ও দফাদার হামলা করে নিরীহ হিন্দুদেরকে লাঞ্ছিত করে, পুজা ও মেলা ভন্ডুল করে দেয়। তারা বিশজন হিন্দুকে আটক করে কুড়ি হাজার টাকা উৎকোচ দাবি করে। পরে পাঁচ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে অন্যায়ভাবে ধৃতদের পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে রাখা হয়। এ ঘটনাটি স্বররাষ্ট্রমন্ত্রী, মহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে জানানোর পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

•

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার আটলরা গ্রামে ১৩ আগস্ট গভীর রাতে দীনবন্ধু মন্ডলের পুত্র শ্যামল মন্ডলের বিয়ে অনুষ্ঠানে হামলা করা হলে উপস্থিত লোকজন দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে গেলে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা গৃহকর্তা দীনবন্ধু মণ্ডলকে গুলি করে হত্যা করে এবং চারজনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। জয়দেবপুর থানার নীলেরপাড়া গ্রামে ২২

এপ্রিল চারটি হিন্দু পরিবারে হামলা করে পনরজনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তারা উক্ত হিন্দু বাড়িগুলিতে লুটপাট ও ভাঙচুর করে।

১৬ জানুয়ারী বগুড়ার গাবতলী থানার রতন ভৌমিকের ভাইয়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলাকালে সুলতানপুর গ্রামের মৃত মজিবর রহমানের পুত্র মাহফুজুর রহমান ও তার সহযোগী গুন্ডারা কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে রতন ভৌমিকের তেরো বছর বয়স্ক একমাত্র কন্যা তপতীরানীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় একমাত্র শ্মশান ঘাটটি দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ১৯৯০ থেকে এ পর্যন্ত এই শ্মশান ঘাট চারবার হামলার শিকার হলো। ৯ জুলাই শ্মশান ঘাটে একটি শবদেহ দাহ করতে গেলে দুষ্কৃতিকারীরা তা দাহ করতে দেয়নি। শ্মশান এলাকায় পার্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে একটি সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এই জেলার বাজিতপুর থানার চন্দ্রগ্রামের বিমল মাস্টারের বাড়িতে ডাকাতি, নান্দিনার চন্দন নন্দীর বাড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে লুট ও ভাঙচুর, বাজিতপুর বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জীবনচন্দ্র সাহার দোকান লুটপাট এবং তার ছেলে জয়ন্ত সাহাকে মারধোর ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এসব ঘটনায় বাজিতপুর এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাছাড়া এই সকল চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা বাজিতপুর বাজারের ব্যবসায়ী বিনয়ভুষণ রায়ের কাছ থেকে একলাখ, কবচু চন্দ্রের নিকট থেকে ত্রিশ হাজার এবং শ্যামলচন্দ্র পালের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এই চক্রের নেতৃত্ব দিচ্ছে বাজিতপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ এবং মথুরাপুরের মজিবর রহমান। অত্যাচারিত হিন্দু সম্প্রদায় বাজিতপুর থানায় মামলা করতে বাধ্য হয়েছে'। মামলা নম্বর ১, তারিখ ০১.০৬.৯৩।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার উত্তর ইউনিয়নের আমেদাবাদ গ্রামের সরস্বতী দত্তের বাড়িতে একদল দুর্বৃত্ত ১৮ জানুয়ারী পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়, ফলে বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভুত হয়ে যায়।

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার ইকরাম গ্রামের রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র অপুকে ১২ মার্চ একদল দুষ্কৃতিকারী অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এই খুনীচক্র ইতিপূর্বে রাজেন্দ্রনারায়ণের জমির ধান জোর করে কেটে নিয়ে যায়। রাজেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তির লোভে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামসু মিয়া একই পরিষদের মেম্বার রঙ্গু মিয়া, খসরু মিয়া, মহারাজ মিয়া, আতাউর রহমান, আক্তার মিয়া প্রমুখ এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে স্থানীয় সচেতন মহল অভিযোগ করেছে।

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানার বারঘড়িয়া গ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারী সকালে গ্রামের একটি দেবোত্তর সম্পত্তির পুকুরে মোঃ মোহসীন গ্রাম ও থানা বদরগঞ্জ রংপুর এর নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন লোক ছোরা, বল্লম, রামদা তীর ধনুক এবং লাঠি নিয়ে গ্রামের হিন্দুদের চাষকৃত উক্ত পুকুরে মাছ ধরতে নামে, গ্রামের লোকজন মাঠের কাজ ফেলে বাড়িতে এলে মোঃ

মোহসীন সদলবলে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে বারঘড়িয়া গ্রামের হিন্দুদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এই দলের আলতাফ হোসেন হাতের ছোরা দিয়ে হরিশচন্দ্র রায়, পিতামৃত মনীশচন্দ্র রায়কে আঘাত করে এবং সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এই দলের সুলতান দীনেশের মাথায় ও হাতে, কাশেম ষষ্ঠীর পিঠে ছোরা দিয়ে আনাজ বল্লম দিয়ে প্রসন্নকে, সাইদুর যামিনীকে, আজিজ অজয়কে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে। এই সন্ত্রাসী দলটি ধীরেনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং গ্রামের অন্যান্য হিন্দু বাড়িতে লুটপাট করে। পুকুরের পাশের মন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তি ভাঙচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে তারাগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ২ তারিখ ১৪.০২.৯৩ এবং জি, আর নম্বর ৬/৯৩।

চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার রহিমনগর শেখ মুজিবুর রহমান কলেজে বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষের সূত্র ধরে স্থানীয় হিন্দুদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি সংঘঠিত সংঘর্ষের পর নাউলার বিজনপাল, সাহাপাড়ায় সম্ভুসাহা ও মহেশ সাহার বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। এছাড়া রহিমনগর বাজারের ষ্টুডিও লীলা ও নুপুরসহ পনরটি হিন্দু দোকান ও সাতটি সেলুন ভাঙচুর, লুট এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা গোহাট গ্রামের নিমাইচন্দ্র ভৌমিকের দুই কন্যা মিতা ও সীমার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের খগেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ির মন্দিরে ১৪ মার্চ তারিখে দুষ্কৃতিকারীরা হামলা করে প্রতিমা ভাঙচুর ও মন্দিরের ক্ষতিসাধন করে। ঘটনার পরের দিন খগেন্দ্রনাথ স্থানীয় থানায় ঘটনাটি অবহিত করার পরেও থানা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সাতক্ষীরা শহরের প্রধান মন্দিরে দুর্বৃত্তরা ১৪ আগস্ট রাতে হামলা চালিয়ে বিগ্রহ ভাংচুর এবং মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। সেই সঙ্গে তারা মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়।

। ১৯৯৪ ।

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার চান্দিশকরা গ্রামের সর্বজনীন কালীমন্দিরে ২১ নভেম্বর একদল সন্ত্রাসী ঢুকে মূর্তি ভাঙচুর করে এবং মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে।

১২ এপ্রিল ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার মধ্যের চর গ্রামের হিন্দুদের উপর বিনা উস্কানিতে হামলা, বাড়ি ঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র অবস্থায় গ্রামে হামলা চালিয়ে ৩৫টি বাড়ি লুট ও ১৯টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেয়, তারা পনর লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

৫ জানুয়ারি রংপুর শহরের শ্রী শ্রী করুণনাময়ী কালী বাড়িতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একদল সন্ত্রাসী মূর্তি

ভাঙচুর করে এবং মন্দিরের সম্মুখে উস্কানিমূলক ভাবে গো মাংস বিক্রি করার ব্যবস্থা করে।

৮ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে মাগুরা জেলার শালিখা থানার বরইচরা গ্রামের করুণাকান্ত মজুমদারকে একই থানার আনন্দনগর গ্রামের নওশের আলী, রিয়াজ আলী মোল্লা, শাহাবুদ্দিন মোল্লা, হাসান আলী, আউয়ুব আলী প্রমুখ সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রসহ আক্রমণ করে মারাত্মক ভাবে জখম করে। ইতিপূর্বে এই সন্ত্রাসী দল দুর্গামণ্ডপে চড়াও হয়ে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে এবং হিন্দু জনসাধারণকে হুমকি প্রদান করে।

সিরাজগঞ্জ শহরের বি, এ, কলেজ রোডের সরোজকুমার কুন্ডুর ইউনিক ফটোষ্ট্যাট নামের দোকানে ১০ ফেব্রুয়ারি হামলা চালায় কিছু সন্ত্রাসী। তারা দোকানের একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন দুইটি টাইপরাইটার একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ও সিলিং ফ্যান লুট করে নিয়ে যায় এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে। সিরাজগঞ্জ সদর থানায় এ ব্যাপারে জানানো হলেও কোন ফল হয়নি। সরোজ কুন্ডু পরে বাধ্য হয়েছেন বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে লিখিত ভাবে জানাতে। কিন্তু এরপরেও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি এবং সরোজকুন্ডের মালামালও ফেরৎ পাওয়া যায়নি।

। ১৯৯৫ ।

মানিকগঞ্জ জেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের দশআনি গ্রামের হিন্দুদের উপর সন্ত্রাসীরা হামলা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। চরমোকিমপুর ও বাসুদেবপুরের একটি প্রভাবশালী মহল প্রশাসনিক সহযোগিতায় পরিকল্পিতভাবে চাঁদা আদায় নারী ধর্ষণ ও ডাকাতি করে আসছে। চাঁদা দিতে অপারগ হওয়ায় ২৬ এপ্রিল গ্রামের ৪/৫টি বাড়িতে সন্ত্রাসীরা লুটপাট ও হামলা করেছে। ৪ মে পরিতোষ চক্রবর্তীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক গণধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসীরা। ৫ মে বিমল সরকারের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট করেছে।

মানিকগঞ্জ শহরের পশ্চিম দাসড়া এলাকার রসময় চক্রবর্তীর কাছে চিঠির মাধ্যমে বেশ কিছুদিন যাবৎ চাঁদাবাজরা মোটা অংকের চাঁদা দাবী করে আসছিল। চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গত বছরের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত চাঁদাবাজ গোষ্ঠী মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রসময় চক্রবর্তীর বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালায়। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে জানানোর পরেও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা না নেওয়ায় জীবনের ভয়ে রসময় চক্রবর্তী সপরিবারে ঢাকা এসে আত্মগোপন করে আছেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার মঞ্জুর আলম মনজু ১৭ জুলাই তার সন্ত্রাসী দল সহ উক্ত ওয়ার্ডের উত্তর কাটালী মৌজার উত্তমকুমার আচার্যের বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে বাড়ির শিব মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে এবং বাড়িতে লুটপাট করে। উত্তমকুমারের সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে ভয় দেখানোর জন্যে সে এই হামলা করে। উক্ত কমিশনার উত্তমকুমারের পরিবারকে অবিলম্বে দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার হুমকি দেয় অন্যথায় নিদারাবাদের মতো হত্যা করা হবে বলে শাসিয়ে যায়।

উত্তমকুমার পাহাড়তলী থানা ও আদালতে মামলা দায়ের করার পরে আদালত উক্ত স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করার পরও ওয়ার্ড কমিশনার ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ছলচাতুরির মাধ্যমে এলাকায় জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

কুষ্টিয়া জেলার খোকশা থানার পদ্মজানি গ্রামের ডাক্তার সমরকুমার ঘোষকে সপরিবারে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্ত্রাসীরা ২৪ জুলাই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। ডাক্তার সমর ঘোষ কুষ্টিয়া জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা। বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পর তিনি শহরে তাঁর এক আত্মীয়র বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। বাড়িতে ফিরে গেলে সন্ত্রাসীরা ডাঃ সমর ঘোষকে হত্যা এবং পরিবারের মহিলাদের গণধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। এই সন্ত্রাসী গ্রুপ একই থানার শিমুলিয়া গ্রামের গোবিন্দ হালদার ও তার পরিবারকে বাড়ি থেকে উৎখাত করে এবং গোবিন্দ হালদারের যাবতীয় সম্পত্তি নিজেদের নামে জোরপূর্বক রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছে এবং গোবিন্দ হালদারের পরিবারের লোকজন নিখোঁজ রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানার সোনামুখী বাজারের কালী প্রতিমা কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী ২ নভেম্বর রাতে ভেঙ্গে ফেলেছে। মন্দিরের হামলার সময় তারা উপসনাগারের পবিত্রতাও নষ্ট করেছে।

৩০ আগষ্ট দুপুরে ঢাকা শহরের রাজারবাগ এলাকায় শ্রীশ্রী বরদেশ্বরী কালী-মন্দিরে একদল মৌলবাদী হামলা করে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীরা ধর্মপ্রাণ হিন্দু ও মন্দিরের পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তাদের বেধম মারধোর করে। এ ব্যাপারে পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস বাদী হয়ে সবুজবাগ থানায় মামলা করেছেন। মামলা নম্বর ঃ ৯৪(৮)৯৫, তারিখ ৩০.০৮.১৯৯৫।

বরগুনা জেলার আমতলী থানার বাগবাজারের দুর্গামন্দিরে হামলা করে ৭টি প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আসন্ন দুর্গাপুজা উপলক্ষে এই প্রতিমা বানানো হয়েছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে বাগবাজার মাদ্রাসার ছাত্র মোঃ জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে একদল মাদ্রাসা ছাত্র এই হামলা চালিয়েছে। প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলায় ঐ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় জানিয়েছেন, এখন আর প্রতিমা তৈরি করে পূজা করার সময় নেই। তাই তারা এবার আর দুর্গা পূজার আয়োজন করবেন না।

ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট চৌধুরী বাড়ি পুজামণ্ডপের নির্মীয়মাণ দুর্গামূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের আশীর্বাদপুষ্ট একদল সন্ত্রাসী। ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি পুজামণ্ডপের মূর্তি ভাঙচুর করে। এই মৌলবাদী গোষ্ঠী এ বছর প্রতিমা নির্মাণের শুরু থেকেই পুজা অনুষ্ঠানের উপর হুমকি দিয়ে আসছিল। এই হুমকি বাস্তবায়িত করা হয় ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে মন্দিরে হামলা এবং প্রতিমা ভাঙচুরের মাধ্যমে।

বরিশাল বি, এম, কলেজের ছাত্রী স্মৃতিকণা বিশ্বাসকে কলেজ ক্যান্টিন থেকে ৯ আগস্ট দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে কাছাকাছি একটি নির্মীয়মাণ দালানে নিয়ে যায়। এই দালানে

স্মৃতিকণাকে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করার পর দুর্বৃত্তরা স্মৃতির নগ্নছবি তুলে রাখে এবং এই ছবি দিয়ে তাকে ব্লাকমেইলিং করার হুমকি প্রদান করে।

সিরাজগঞ্জে সপ্তম শ্রেণীর একটি ছেলেকে অপহরণ করা হয়, অপহৃত মানিকচন্দ্র সরকারের পিতামাতার কাছে বিপুল অংকের মুক্তিপণ দাবী করে অপহরণকারীরা সংবাদ পাঠালে, মানিকের বাবা এই বিপুল অংকের টাকা দিতে অপারগতা জানালে অপহরণকারীরা শিশু মানিকচন্দ্র সরকারকে হত্যা করে।

অব্যাহত সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, সরকারি নিয়োগে সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক বৈষম্য এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সাম্প্রদায়িক করণের প্রতিবাদে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আবাসগৃহে কালো পতাকা উত্তোলন ও প্রতীকী ধর্মঘট পালন করে। ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে।

দুর্গা প্রতিমা বির্সজন দেয়ার আগে যশোর শহরে ০৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় একটি শোভাযাত্রা বের হলে মৌলবাদীরা উক্ত শোভাযাত্রায় হামলা করে। এই হামলায় যশোর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতা মোহিতকুমার নাথসহ চারজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু আহত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিমাবাহী ট্রাক যশোর শহরের খুলনা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছলে দুর্গা প্রতিমাকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয় এবং এক পর্যায়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করা হয়।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার ভূমি অফিসের পার্শ্ববতী একটি মাঠে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণ শ্যামাপূজার আয়োজন করার উদ্যোগ নিলে উক্ত থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আলিমুদ্দিন একদল মৌলবাদী নিয়ে পূজার আয়োজনে বাধা দেয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের সঙ্গে মোঃ আলিমুদ্দিন ও তার দলের কথা কাটাকাটির এক পর্যায় মৌলবাদীরা কালী মুর্তিটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ২৩ অক্টোবরের এই ঘটনায় স্থানীয় প্রগতিশীল লোকেরা ক্ষুব্ধ হলে গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক মোঃ আলিমুদ্দিনকে পার্শ্ববর্তী পলাশবাড়ি থানায় বদলী করে নিয়ে যান।

গাজীপুর জেলার টঙ্গী বাজারের দুর্গা মন্দিরে দীর্ঘদিন যাবৎ পূজা অর্চনা চলে আসছে। আসন্ন দূর্গাপূজা উপলক্ষে মন্দিরের সংস্কার কাজ আরম্ভ করলে ২০.০৯.৯৫ তারিখে সমাজবিরোধী কিছু সংখ্যক লোক উক্ত সংস্কার কাজে বাধা প্রদান করে। ০৪.১০.৯৫ তারিখে নাটোর শহরে বিজয়ার মিছিলে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় ধর্মপ্রাণ কয়েকজন হিন্দু আহত হয়। ঢাকার সূত্রাপুর থানার মালিটোলায়া ০৪.১০.৯৫ তারিখে বিজয়ার মিছিলে হামলা করা হয়। উল্লেখিত তারিখে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে বিজয়ার শোভাযাত্রায় হামলা করা হয়। ঢাকা মহানগরের গুলশান থানার বেরাইদে কতিপয় সন্ত্রাসী নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে। টাঙ্গাইলের

মির্জাপুর থানার বানাইল ইউনিয়নের মানিশাইল গ্রামের শ্রীদামচন্দ্র সরকারের বাড়িতে আসন্ন দূর্গা পূজা উপলক্ষে নির্মিত দুর্গা প্রতিমা সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং প্রতিমা বানানোর অপরাধে (?) মূর্তি নির্মাণ শিল্পী শ্রীদামপালকে (৩০) মারধোর করেছে। গৃহকর্তা শ্রীদামচন্দ্র সরকারের পুত্রবধূ প্রতিমারাণীকে (২৫) লাঞ্ছিত করেছে। বৃহত্তর বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠির আচার্যপাড়া সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরে এবার সন্ত্রাসীরা পূজা করতে বাধা দিচ্ছে। ফলে পূজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ০৩.১০.৯৫ তারিখে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার গুটুদিয়া ইউনিয়নের খামারবাড়ি পূজা মন্ডপে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করে এবং মহিলাদের লাঞ্ছিত করে। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানার শ্যামগঞ্জ বাজারে হামলা চালিয়ে নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলেছে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি। একই থানার ঠাকুরকোলা বাজারের নির্মীয়মাণ দূর্গা প্রতিমা ২৫.০৯.৯৫ তারিখে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ভেঙ্গে ফেলে। নারায়ণগঞ্জ শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কের আজহার সুপার মার্কেটের ছাদ থেকে ০৪.১০.৯৫ তারিখে আমলাপাড়ার বিজয়া শোভাযাত্রার উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে বঙ্কুবিহারী আখড়ার কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির নেতা খোকন ঘোষাল আহত হন।

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর থানার নিজপাট (নওয়াব বাড়ি) গ্রামের শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার নাথের বাড়িতে ১৭.০৭.৯৫ তারিখে বেলা দুই ঘটিকার সময় ৪০/৪৫ জনের একটি দল হামলা করে। তারা বাড়িতে অবস্থিত দেবালয় ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এই সন্ত্রাসীচক্র জৈন্তাপুর বাজার সংলগ্ন খাসিয়া হাটিতে অবস্থিত উক্ত ধীরেন্দ্র নাথের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করে সোয়া লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গিয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার চালকা ইউনিয়নের রতনকান্দি গ্রামের গৌরাঙ্গ মন্দিরে একদল সন্ত্রাসী ০১.০৭.৯৫ তারিখে হামলা চালায়। মন্দিরের একটি রাধাকৃষ্ণ যুগল পিতলের মূর্তি, একটি পিতলের গোপাল মূর্তি এবং পাথরের একটি নারায়ণ মূর্তি লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি থানার সিমলা মনোহর মৌজা এলাকার সর্বজনীন দুর্গা ও কালী মূর্তি একদল সন্ত্রাসী ২৮ ডিসেম্বর '৯৫ তারিখে ভাঙচুর করেছে। এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী গোষ্ঠি উক্ত মন্দির দু'টির মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার দৌলতপুর গ্রামের যোগেশচন্দ্র মণ্ডলকে ১৭ অক্টোবর তারিখে একদল সন্ত্রাসী আক্রমণ করে। যোগেশ মণ্ডলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় মৃত আজিজ খানের তিন পুত্র হোসেন খান, করিম খান ও রহিম খান। তারা যোগেশচন্দ্র মণ্ডলের সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে দ্রুত দেশত্যাগ করার হুমকি প্রদান করে। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া এলাকার শ্রীশ্রী জগদীশ্বরী মাতার মন্দিরে একদল সন্ত্রাসী ২৪.০৯.৯৫ তারিখে হামলা করে। এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী শত বছরের প্রাচীন এই মন্দিরের সমুদয় মুল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় এবং প্রতিমা ভাঙচুর করে। ২৫.১০.৯৫ তারিখ রাতে নেত্রকোণার বারহাট্টায় কালী পূজার অনুষ্ঠান

চলাকালীন সময় একদল সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী পূজা মণ্ডপ এলাকায় হামলা করে। সন্ত্রাসীদের বোমার আঘাতে একজন শিশুসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসন কোন ভূমিকা না নেয়ায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া থানার রাগুরিয়া গ্রামের শ্রী শ্রী রাইরসরাজ সেবাশ্রমে ০৭.১১.৯৫ তারিখে এনায়েত হোসেন, সবুজ মিয়া, জোবেদ আলী সিকদার সদলবলে হামলা করে। উক্ত আশ্রমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় এই সন্ত্রাসীরা হামলা করে লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এবং নানা রকম সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক গালাগাল দিতে থাকে।

মুন্সিগঞ্জ পৌর এলাকার পারুলপাড়ার সুবাসচন্দ্র দাসের বাড়িতে ২০.১০.৯৫ রাতে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। ঝালকাঠি জেলার নলছিটি থানার শেখের কাঠি গ্রামের জগন্নাথকুমার শীল, পিতা নরেশচন্দ্র শীল, এর উপর একই গ্রামের মৃত আঃ আজিজ হাওলাদারের পুত্র আবদুল মান্নান ১০.১১.৯৫ তারিখে বরিশাল যাবার পথে ধারালো অস্ত্র সহযোগে আক্রমণ করে। আব্দুল মান্নানের আক্রমণে জগন্নাথকুমার শীল গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

। ১৯৯৬-৯৭ ।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বহীনতার কারণে নওগাঁয় সুষ্ঠুভাবে এবার (৯৬) দুর্গোৎসব সম্পন্ন হতে পারেনি। দুর্গোৎসবের নবমীর রাতে নওগাঁয় প্রকাশ্যে ছিনতাইএর ঘটনা ঘটেছে শতাধিক। এছাড়াও বিদ্যুতের সীমাহীন লোড শেডিং-এর কারণে বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু তরুণী শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে পূজার প্রস্তুতিকালে জেলার মহাদেবপুর থানায় সন্ত্রাসীরা বেশ কয়েকটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। টাঙ্গাইল জেলার বাশাইল থানার ফুলবাড়ী গ্রামের মৃত ধনীরাম ঘোষের পুত্র পরেশচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘ দিন ধরে উক্ত এলাকার ইসমাইল হোসেন প্রমুখদের নির্যাতন-নিপীড়ণের শিকার। সম্প্রতি আবার পরেশচন্দ্র ঘোষের পার্শ্ববর্তী বাড়ির খন্দকার আবু বকর গং তার উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। তারা ১৩.১০.৯৬ তারিখে নির্মীয়মাণ দুর্গা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। উল্লেখ্য, উক্ত সন্ত্রাসীরা ১.২.৯৬ তারিখেও মন্দিরে রক্ষিত মূর্তি ভেঙ্গে ছিল। বর্তমানে উক্ত সন্ত্রাসীরা পরেশ ঘোষকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে এবং দেশত্যাগ করতে বলছে। বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার সমাদ্দারখালী মন্দিরের পুরোহিত সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী (৫৫) কে ১২.১০.৯৬ তারিখ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সমাদ্দারখালীর শ্রী শ্রী জিউধরা কালীমন্দিরে ২০ একর ২৯ শতক জমি দখল করার জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

বাগেরহাট শহরের পুরাতন বাজার এলাকার তহশীল অফিস রোডস্থ জনৈক ডাবলু বসুর বসতবাড়িতে হামলা, লুণ্ঠন ও হত্যা প্রচেষ্টাসহ এক মধ্যযুগীয় পৈশাচিক ঘটনাকে

ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য সন্ত্রাসীদের দ্বারা প্রভাবিত একটি প্রভাবশালী মহল অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ২৫ আগষ্ট দুপুরে ডাবলু বসুর বোন ডালিয়া বসু বাসায় ফেরার পথে মুন্সিগঞ্জ কালীবাড়ির সামনে জনৈক আলহাজ্ আব্দুর রব মটর সাইকেল যোগে ডালিয়া বসুর গতিরোধের মাধ্যমে তার কাছ থেকে ২৩ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হলে মটর সাইকেলসহ উক্ত ছিনতাইকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। আব্দুর রবের সন্ত্রাসী বাহিনী মামলা প্রত্যাহারের জন্য প্রকাশ্যে জীবননাশের হুমকিসহ ডাবলু বসুর স্ত্রী ও বোনকে রাস্তায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। কিছুদিন পর আব্দুর রবের ভাই মোশারফ হোসেনসহ ৪/৫ জনের সন্ত্রাসী দল ডাবলু বসুর বাসায় অতর্কিতে হামলা করে আসবাবপত্র ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালায়। বাসায় ডাবলুকে না পেয়ে তার শিশু পুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার প্রচেষ্টা চালায় এবং ভাঙা কাচের টুকরা দিয়ে তার যুবতী স্ত্রীকে অমানবিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। পুলিশ খবর পেয়ে শহর থেকে মোশারফ হোসেন ও সাহিদুর রহমানকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে একটি প্রভাবশালী মহল এই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য অশুভ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ডাবলুসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

১৫.০৯.৯৬ তারিখ রোববার নারায়ণগঞ্জ শহরের গলাচিপায় অবস্থিত রামকানাই আখড়া মন্দিরে একদল সশস্ত্র যুবক হামলা চালিয়ে মন্দিরে রক্ষিত দুর্গা প্রতিমার দুটি হাত ভেঙ্গে ফেলেছে। হামলায় পরিমলরাণী ঘোষ (৬৫) নামে একজন মহিলা আহত হয়েছে। জেলার ফতুল্লা থানার পঞ্চবটি বাসস্ট্যান্ডের সামনে অবস্থিত লোকনাথ মন্দিরটি ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গে ফেলেছে। ফলে এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানা ময়না ইউনিয়নের ময়না দুর্গা মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা ৮.১০.৯৬ তারিখে কতিপয় সমাজবিরোধী ভেঙে ফেলেছে। ১২.১০.৯৬ তারিখে বগুড়া জেলার মালতীনগরের একটি পূজা মণ্ডপে নির্মীয়মান দুর্গা মূর্তি সন্ত্রাসীরা ভেঙে ফেলে। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার আলেকজান্ডার বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রাণদাকান্ত দাস, পিতা মৃত নিবারণ কান্ত দাস, এর উপর অত্র এলাকার বাবুল, সালাউদ্দিন, সেলিম, শাহাদাত হোসেনসহ কয়েকজন সন্ত্রাসী উপর্যুপরি আঘাত করে এবং ২ লাখ ৯ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। উক্ত সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরাফেরা করছে। তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার না করলে শ্রীদাসসহ পরিবারের সকলকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।

২৮.৮.৯৬ তারিখে ঢাকা মহনগরীর সবুজবাগ থানার রাজারবাগ ঐতিহাসিক বরদেশ্বরী কালী মন্দিরে একদল সন্ত্রাসী হামলা ও ভাঙচুর করে। ওরা মন্দিরের সম্পত্তি জবর দখলের চেষ্টা করছে। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানাধীন ধামশ্রেণী ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রাম আসামী ধরতে যাওয়া পুলিশের উপস্থিতিতে ডাকাতি, লুটপাট ও মারপিটের

ঘটনায় জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর '৯৬ উলিপুর থানার এস, আই মিজানুর রহমান এবং এস, আই রেজাউল করিম পুলিশ ভ্যানে একদল পুলিশসহ পালপাড়া ঢুকে রঞ্জন পাল, স্বপন পাল ও নিরঞ্জন পালকে ঘুম থেকে ডেকে জানায়, রাস্তায় ওসি সাহেব আছে আপনাদের যেতে হবে। এ কথা শুনে তারা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। এই সুযোগে এস, আই দ্বয়ের সঙ্গে আসা চিহ্নিত ডাকাত দবির ও তার দলের আমিনুল, আনিছুর, আবিদুর ও কাশেম উল্লেখিত ব্যক্তিদের ঘরে প্রবেশ করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের পর নগদ ২৮ হাজার টাকা, স্বর্ণালংকারসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় আনিছুর ও কাশেমকে রঞ্জন পালের মা ও বাবা জাপটে ধরে চিৎকার করতে থাকে। তাদের চিৎকারে গ্রামবাসী দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে কাশেম ও আনিছুর পুলিশের সাহায্য কামনা করে। এ সময় এস, আই মিজানুর রহমান ও রেজাউল করিম বাঁশি বাজিয়ে আটক ব্যক্তিদের উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের ভূমিকায় পালপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অধিকাংশ মানুষ সন্ত্রাসীদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

৩১.৮.৯৬ শনিবার গভীর রাতে খুলনা মহানগরীর রায়েলমহল সর্বজনীন পূজা মণ্ডপটি দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে দিয়েছে। এ ব্যাপারে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ১১.৮.৯৬ তারিখে দুপুর বেলা জনৈক জিবলু খুলনা বেতারের সঙ্গীত শিল্পী শিপ্রা দাসকে (২৩) মাগুরা শহরের সাধনা ঔষধালয়ের সামনে রাস্তার উপর ফেলে উপর্যুপরি অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে।

ধানের শীর্ষে ভোট না দেয়ার কারণে বিএনপির সন্ত্রাসীরা ফেনী-২ নির্বাচনী এলাকার (দাগনভূঞা) সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে। বরিশাল জেলার আগৈলঝরা থানার মহানপুর গ্রামের অনন্ত পান্ডের কন্যা সরস্বতী পান্ডে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী, ১৯৯৪ সালের আগষ্ট মাসে সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহৃত হয়। ফলে অনন্ত পান্ডে সন্ত্রাসী আনোয়ার উল্লাহর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে। ২১ আগষ্ট '৯৬ আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে প্রধান আসামী আনোয়ার উল্লাহর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সাক্ষীদের উপর হামলা চালায়। বিজয় দিবস উপলক্ষে দাবীকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় জেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং পুরানপৈল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নিখিলচন্দ্র মণ্ডলকে ২১ ডিসেম্বর '৯৬ লাঞ্ছিত করা হয়েছে। নিখিলবাবু জেলা যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকদ্বয় জাকির হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মামুন চপল দাবীকৃত অতিরিক্ত চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে প্রকাশ্য দিবালোকে উক্ত দুই নেতা তাকে প্রহার করে এবং হত্যার হুমকি দেয়।

জয়পুরহাট মহাশ্মশানের দক্ষিণ-পূর্ব স্থানের নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ব্যাপক হারে বালি ও মাটি কেটে জনৈক আবদুস সোবহান তরফদার, পিতা-মৃত সলমন তরফদার, সাং খঞ্জনপুর (বাগানবাড়ি)-ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। তাছাড়া ২২.১১.৯৬ তারিখে মহাশ্মশানস্থ শীতলা মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। একটি

কুচক্রীমহল মহাশ্মশান ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এসব করছে বলে মহাশ্মশান কমিটি জানিয়েছে।

১৪.১২.৯৬ তারিখে বাগেরহাট জেলার সদর থানার যাত্রাপুর শ্রীমান লাউপালা গোপাল মন্দিরের গোপাল বিগ্রহ লুণ্ঠিত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ঐদিন গভীর রাতে মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে মূল্যবান মূর্তিসহ অন্যান্য জিনিস নিয়ে যায়। থানায় মামলা হয়েছে। ২২.১.৯৭ তারিখ রাতে রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়ার আনন্দময়ী কালী মন্দিরে একদল দুষ্কৃতিকারী ও সমাজবিরোধী মন্দিরে রক্ষিত কষ্টিপাথরের মূর্তি ও স্বর্ণালংকার লুটপাট করে, থানায় মামলা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনও গৃহীত হয়নি। গোপালগঞ্জ সদর থানার উলিপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী ডিলপুর কালী মন্দিরের বিগ্রহ এবং মন্দির সম্প্রতি দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর করেছে। দুর্বৃত্তরা মন্দিরের জানালার শিক ভেঙে ভেতরে ঢুকে কালী মূর্তির দুটি হাত, জিহ্বা, মহাদেবের হাত ও পূজার ঘটগুলো ভেঙে ফেলে এবং মন্দিরের ক্ষতি সাধন করে। এ ব্যাপারে গোপালগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার উত্তর বগাচতর গ্রামে নিরীহ সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের উপর জনৈক আবু তাহের মাষ্টারের লাঠিয়াল বাহিনী সম্প্রতি নির্যাতন নিপীড়ন চালায়। লাঠিয়াল বাহিনী স্থানীয় নৈদরবাগী জলদাস এবং তাদের জ্ঞাতিদের পূর্বপুরুষের জমি জোরপূর্বক দখলের জন্য হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বাড়ীর নারী-পুরুষ সকলকে বিবস্ত্র করে মারধর করে। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার ধর্মপুর গ্রামের ৫টি মন্দিরের দরজা-জানালা ভেঙে ১৬.১১.৯৬ তারিখ রাতে লুটপাট চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসীরা মন্দিরের বিগ্রহ, তৈজসপত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যায়।

বানারীপাড়া থানার মাছরং গ্রামে একদল সন্ত্রাসী ১৪ ফেব্রুয়ারী '৯৭ জনৈক হরিপদ হালদারের জমি দখলের চেষ্টা করলে তার বিধবা স্ত্রী ও তিন কন্যা বাধা দেন। তখন সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। হামলায় হরিপদ হালদারের স্ত্রী শরবিন্দু হালদার, তার তিন মেয়ে ভারতী, কল্পনা ও কাজল গুরুতর আহত হয়। এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

১৫.১১.৯৬ শুক্রবার ৫০/৫৫ জনের একদল সন্ত্রাসী সকাল ৯টায় বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রহমতপুরের বিশিষ্ট ও ধনাঢ্য ব্যক্তি রামসদয় মুখার্জীর বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে। বিবরণে জানা যায়, রামসদয়ের জমিতে জনৈক ইজ্জত আলী দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ একটি ঘর তৈরী করে দোকান চালাতো, মালিক ঐ জমি ছেড়ে দিতে বললে ইজ্জত আলীসহ সন্ত্রাসীরা বাড়িতে আগুন দেয়। ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষাধিক টাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারী জেলার রাজৈর থানার দক্ষিণ চাঁদপট্টি গ্রামের সন্ত্রাসী কাদের ও তার সহযোগী মোকাই বাহিনীর সদস্যরা একই গ্রামের শিবনাথ দাসের বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা লুটপাট ও ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় ১৭ জন আহত হয়।

মাদারীপুর জেলার রাজৈব থানার বদরপাশা ইউনিয়নের চর মোস্তফাপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন ধরে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসীর নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার। সন্ত্রাসীরা ১৭.৯.৯৬ তারিখে উক্ত গ্রামের মণীন্দ্রমোহন সন্ন্যাসীর বিধবা স্ত্রী সুনীতিরানী সন্যাসী ওরফে স্বর্ণলতাকে হত্যা করে। থানায় মামলা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা বর্তমানে পিতৃমাতৃহীন দুই ভাই রমণীমোহন ও নিতাই চাঁদকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে এবং নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধ্য করছে। জেলার সদর থানাধীন জামুরা গ্রামের যোগেশচন্দ্র শীলকে সপরিবারে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকার সন্ত্রাসী সোবহান মৃধা, পিতা মৃত হামেজ মৃধা, শাহ আলম মৃধা, পিতা মৃত কেরামত মৃধা, আজিজ মৃধা, পিতা মৃত আবদুল হাকিম মৃধা, চান্দ মিয়া, পিতা মৃত আয়েজউদ্দীন মৃধা প্রমুখ ২৩ ফেব্রুয়ারী তার আবাদী জমিতে পুকুর খনন করেছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হলেও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানার অন্তর্গত ৫ নীলগঞ্জ ইউনিয়নের আমিরাবাদ সর্বজনীন কালীমন্দিরের কালী প্রতিমা গত ২৪.১০.৯৬ তারিখে সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গে ফেলে। ফলে এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি সন্ত্রাসী বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের শ্রী মিন্টু ঘোষের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে। সম্প্রতি এই সন্ত্রাসী চক্র রাজেন্দ্রপুর বাজারে মিন্টু ঘোষের উজ্জ্বল সুইটমিটে হামলা চালায় এবং মিন্টু ঘোষকে মারাত্মকভাবে জখম করে। সন্ত্রাসীরা এখন মিন্টু ঘোষকে দেশত্যাগের হুমকি দিচ্ছে। জেলার জয়দেবপুর শহরের শ্মশানের জমি বিভিন্নভাবে জবর দখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে একটি কুচক্রীমহল। এই জবর দখলের প্রতিবাদ জানানোর ফলে ১৪.১.৯৭ তারিখে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, শ্মশান পরিচালনা পরিষদের সচিব নেপাল চক্রবর্তী, নীহাররঞ্জন দে প্রমুখকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুচক্রীমহল বোমা হামলা চালায়। তবে বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তারা প্রাণে বেঁচে যান। এ ব্যাপারে থানায় ডায়রী করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানার বুড়াইস ইউনিয়নের অন্তর্গত সড়ারকান্দি গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন ধরে শান্তি সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বসবাস করে আসছে। সম্প্রতি জনহিতকর কাজের নামে দুই কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য এবং ৮০ হাত প্রস্থ রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে টিওপাড়া সুবোধ রায় এর বাড়ী থেকে সড়ারকান্দি মৌজার দিলীপ বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ফসলী জমির ফসল লুটপাট করা হচ্ছে। জেলায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নম্বর ফরিদপুর জেলার দেওয়ানী ৪৯/৯৬ ফৌজদারী এম পি ৩১.৯৭ এবং ৩২.৯৭।

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার শ্রীকাইল ইউনিয়নের চুলুরিয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা উক্ত এলাকার মৃত সুন্দর আলীর পুত্র মতিন এবং তাঁর সহযোগীদের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার। এই সন্ত্রাসী বাহিনী ১৩.১.৯৭ তারিখে উক্ত এলাকার শংকর চন্দ্র দেবের বাড়িতে আগুন দেয়ার সময় গ্রামের জনসাধারণের কাছে মতিন নামক সন্ত্রাসী ধরা

পড়ে। পরবর্তীতে সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধভাবে এসে মতিনকে ছিনিয়ে নেয় এবং প্রতিশোধ নিতে উক্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাড়ায় আরও কয়েকবার আগুন দেয়। থানায় মামলা হয়েছে বর্তমানে সন্ত্রাসীদের ভয়ে ধর্মীয় স্যখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে।

২৬.১০.৯৬ তারিখে একদল সন্ত্রাসী চাঁদা চেয়ে না পেয়ে চাঁদপুর জেলার মতলব থানার পশ্চিম বাইশপুর গ্রামের কার্তিক চন্দ্র বর্মণের বাড়ীর মন্দিরের লক্ষ্মীমূর্তি ভেঙে ফেলে। উক্ত এলাকায় হাবিব, মজিবুর, মোশাররফ, বাদল, তাজুদ্দিনসহ আরো অনেকে ইন্দ্রজিত বর্মণ, সুনীল বর্মণ, মরণ বর্মণ ও প্রদীপ বর্মণের কাছে কিছুদিন পূর্ব থেকেই চাঁদা দাবি করে আসছিল। ২৬ তারিখে চাঁদা চেয়ে না পেয়ে বর্মণ পাড়ায় স্থাপিত লক্ষ্মীমূর্তি ভাংচুর করে। ৭.১১.৯৬ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার ঘোষড়া ও খলিষাখালি গ্রামে ২০.২৫ জনের মুখোশধারী একদল সন্ত্রাসী উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে বাড়ী-ঘর লুটপাট করে। সন্ত্রাসীরা উক্ত এলাকার দিন বন্ধু ও অসীম মুখার্জির ঘর-বাড়ির মালামাল লুটপাটের পর হত্যার হুমকি দেয়।

২৬.১২.৯৬ বৃহস্পতিবার শব-ই-বরাতের রাতে ভোলা শহরের ধাঙ্গড় পল্লী একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক পুড়িয়ে দিয়েছে। ধাঙ্গড় পল্লী সংলগ্ন লাশকাটা ঘরের পার্শ্ববর্তী কবরস্থান থেকে লাশ তোলার অভিযোগে উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা ধাঙ্গড় পল্লীতে প্রথমে ভাঙচুর ও পরে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। উক্ত ধাঙ্গড় পল্লী ভস্মীভূত হওয়ার ফলে প্রায় দেড় শতাধিক লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রতি বছরের ন্যায় এবারো গোবিন্দগঞ্জ থানা ভূমি অফিসের পার্শ্ববর্তী মাঠে কালী পূজার আয়োজন করে। কিন্তু পূজার দিন সকাল ১০টায় থানা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আলিমুদ্দিন কিছু মুসল্লি নিয়ে পূজার আয়োজনে বাধা দেয় এবং কথাবার্তার এক পর্যায়ে উক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা কালী মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ শহরের রামকৃষ্ণ মিশন সংলগ্ন কালী মন্দিরে ঢুকে কতিপয় সন্ত্রাসী ২৩.১১.৯৬ তারিখে ১৬টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। পূজা মণ্ডপে সশস্ত্র হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, চাঁদাবাজি এবং লুঠপাটের প্রতিবাদে মির্জাপুরের পাকুল্যায় এবং রংপুরের বরাতি কামার পাড়ায় এবার (১৯৯৭) দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ রাখা হয়েছে।

কুমিল্লার বরুড়া তলাগ্রাম ভাওয়াল বাড়ি পূজা মণ্ডপে ১০ অক্টোবর '৯৭ হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছে সন্ত্রাসীরা। পূজা কমিটির কাছে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করলে তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালায়। এ ব্যাপারে পূজা কমিটির পক্ষে হারুন অর রশিদ, মোঃ আঃ রশিদ, হুমায়ুন প্রমুখকে বাদি করে মামলা করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার পাকুল্যায় শ্রীশ্রী সর্বজনীন কালী মন্দিরের পূজা মণ্ডপে ৮ অক্টোবর '৯৭ জিন্না ও সোহেল-এর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে মূর্তি

ভাঙ্গার চেষ্টা চালায় । হামলাকারীদের জনতা ধরে ফেলে এবং পুলিশে সোপর্দ করে। পরে সন্ত্রাসীরা জামিনে মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে হুমকি দেয়।

ফেনী জেলার ফুলগাজী থানার গোপালচন্দ্র ধর উক্ত এলাকার দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিহিংসার শিকার। দুষ্কৃতকারীরা ২১.৬.৯৭ তারিখে গোপালচন্দ্র ধরের বাবা ও ভাইকে মারাত্মক ভাবে জখম করে এবং তাঁর বোনকে অপহরণ করে। পরবর্তীতে নিম্ন আদালতের রায়ে সন্ত্রাসীরা সাজাপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন, কিন্তু উক্ত সন্ত্রাসীদের সহযোগীরা গোপালচন্দ্র ধরকে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে এবং হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের শুরুতে কতিপয় সন্ত্রাসী পিরোজপুর জেলার সদর থানার রায়েরকাঠি গ্রামের রায়বাড়ীর পূজা প্রতিমা ভাঙচুর করে।

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া পৌরসভার উত্তর কন্দর দুর্গাপূজা মণ্ডপের সামনে ৬ অক্টোবর '৯৭ টিকিকাটা গ্রামের জনৈক যুবক মজিবুর রহমান (২৫) একই গ্রামের শিউলি মণ্ডলকে (২০) পূজা দেখতে আসা কয়েকশ মানুষের সামনে বেদম প্রহার এবং গালে ও ঠোঁটে কামড়ে মারাত্মক জখন করে। নববধু শিউলি তার স্বামীর সংগে পূজা দেখতে এসেছিল। শিউলি মঠবাড়িয়া হাসপাতালে ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করে। মজিবুর রহমানকে জনসাধারণ আটকে মঠবাড়িয়া থানায় পুলিশের কাছে সোর্পদ করেছে। পিরোজপুর সদর থানার ২ কদমতলা ইউনিয়নের পোয়গোলা গ্রামের শিক্ষক বিনয় ভুষণ চক্রবর্তীকে (সোনাই ঠাকুর) ভিটা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে ০৭.৫.৯৭ তারিখে একদল সশস্ত্র লোক হামলা চালায়। হামলাকারীরা বিনয়ভূষণ এবং তার পুত্র অমলকৃষ্ণকে গুলি করে। বিনয়ভূষণ পরে ১৫.০৭.৯৭ তারিখে মারা যান। বর্তমানে বিনয়ভূষণের পরিবারের লোকজন প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কুচক্রীমহল তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ থানার কালাপানিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মন্টুকুমার বণিককে সপরিবারে হত্যার হুমকি দিচ্ছে একই এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী জনৈক হায়াত। বাহিনীর সন্ত্রাসীরা ২৩.০৩.৯৬ তারিখে সন্দীপ শহর থেকে ফেরার পথে মন্টু বণিক এবং তার দুই পুত্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়।

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার উত্তর বগাচতর গ্রামে নিরীহ সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের উপর জনৈক আবু তাহের মাস্টারের লাঠিয়াল বাহিনী সম্প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়। লাঠিয়াল বাহিনী স্থানীয় নৈদরবাগী জলদাস এবং তাদের জ্ঞাতিদের পূর্বপুরুষের জমি জোরপূর্বক দখলের জন্য হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বাড়ীর নারী-পুরুষ সকলকে বিবস্ত্র করে মারধর করে।

গাইবান্ধা সদর থানাধীন বাদিয়াখালী ইউনিয়নের গোয়াইলবাড়ি গ্রামের অজয়কুমার সরকার, পিতা মৃত দীনবন্ধু সরকারের বাড়ির ১৪ শতাংশ জমি অবৈধভাবে দখলের জন্যে একই গ্রামের জনৈক তৌহিদুল ইসলাম ওরফে ওয়াদুদ মণ্ডল মিথ্যা মামলা দায়েরসহ

বিভন্নভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন ও হয়রানি চালিয়ে আসছে। তৌহিদুলের শ্যালক রাজশাহী ডিআইজি অফিসে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল আঃ রউফ, (পুলিশ নং-১)-এর প্রত্যক্ষ মদতে গত ৯.২.৯৭ তারিখে অজয়ের ছোট ভাই অশোককুমার সরকারের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে গুরুতর জখম করা হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হলেও অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার বিভিন্ন স্থানে ১৭.১২.৯৭ এবং ১৮.১২.৯৭ তারিখে মন্দির ও মূর্তি ভাংচুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে।

১৭.১২.৯৭ তারিখে জেলার সাটুরিয়া থানার তিল্লি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে পরাজিত প্রার্থীর সমর্থক একদল সন্ত্রাসী এলাকার ধর্মীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা নরেশ ঋষি ও নবীন ঘোষের বাড়ির কালী ও শীতলা মূর্তিসহ মন্দির ভাঙচুর এবং বাড়ী ঘরে লুটপাট চালায়।

মানিকগঞ্জে ১০ অক্টোবর' ৯৭ একদল সন্ত্রাসী সাটুরিয়া থানার বেতাড়িয়া গ্রামের ঠাকুরদাস কর্মকারের বাড়ির পূজামণ্ডপে হামলা চালায়। সন্ত্রাসী দল ঠাকুরদাসের কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করলে তিনি চাঁদা দিতে অপরাগতা জানান। এর পর এলাকাবাসী চারদিক থেকে সন্ত্রাসীদের ঘিরে ফেলে এবং সন্ত্রাসী টিটু ও তোতাকে দুইটি রিভলবারসহ আটক করে। পরে সন্ত্রাসীদল আটককৃত টিটু ও তোতাকে ছিনিয়ে নিতে ঐ বাড়িতে দু'দফা হামলা চালায় এবং ভাঙচুর করে।

হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানাধীন ভদ্রেশ্বর ইউনিয়নের রশিদপুর চা বাগান এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছেন। ৬.৩.৯৭ রাতে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে উক্ত চা বাগানের নাট মন্দির প্রাঙ্গণে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। কিন্তু উক্ত গ্রামের কতিপয় দুষ্কৃতকারী ঐ নামযজ্ঞ মঞ্চ ভেঙে ফেলে এবং লোকজনকে মারধর করে। এ ব্যাপারে থানার মামলা দায়ের হলেও অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ইতিপূর্বে উক্ত নাটমন্দিরের শিবলিঙ্গ, গণেশ ও পার্বতী মূর্তি দুষ্কৃতকারীরা চুরি করে নিয়ে গেছে।

ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার মেগচামী ইউনিয়নের কলাগাছী গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বসবাস। ১৮ মে'৯৭ বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসব চলাকালে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও সমাজ বিরোধী শামছুদ্দিন মোল্যা, রাজু মোল্যা, কামরুল মোল্যা, মতিয়ার মোল্যা, বাদশা মোল্যা, হালিম মোল্যা এবং বাচ্চু মোল্যাসহ তাদের কতিপয় সহযোগী উক্ত গ্রামের সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ীর পূজা মণ্ডপ ভাঙচুর করে এবং উপস্থিতি ভক্তদের মারধর করে। সন্ত্রাসীদের কাজে বাধা দেওয়ায় তারা উক্ত এলাকার চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খুরশিদুল আলম, দফাদার অরবিন্দ বিশ্বাস এবং জনৈক সাধন দাসকে মারধর করে। থানায় মামলা হয়েছে । মামলা নং ১৫/৯৭ তারিখ ১৯.৫.৯৭। সন্ত্রাসীরা বর্তমানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

গত ২৯ নভেম্বর, শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার শালুয়াবাজারের কাছে সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি উক্ত এলাকায় সুশান্ত বিশ্বাস (২৫), ফুলমোহন বাঁড়ে (২৬), স্বপন(২৭), নামের তিন ব্যক্তিকে খুন করেছে। আহত হয়েছে আরও ১৫ জন। সন্ত্রাসীরা উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে লুটপাট করে। বর্তমানে উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

সন্ত্রাসীরা ০৭.০৯.৯৭ তারিখে খুলনা জেলার ফুলতলার দক্ষিণডিহি গ্রামের সিকিরহা বাজারে নিজস্ব মিষ্টির দোকানে গভীর রাতে হত্যা করেছে উক্ত এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী বলাইচন্দ্র করকে। এ ব্যাপারে বলাইচন্দ্র করের পুত্র বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং (ফুলতলা থানা-৩.৫৬.৯৭)। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে জানানোর পরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

৬.৫.৯৭ তারিখে সিরাজগঞ্জ শহরের ইবি রোডস্থ ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী বাদলচন্দ্র দাসকে কতিপয় সন্ত্রাসী ও সমাজবিরোধী নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ঘটনায় উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন চরম নিরাপত্তহীনতার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে। মৌলভীবাজার বড়লেখা থানার নিজ বাহাদুর গ্রামের শ্রী শ্রী নিতাইচাঁদ মহাপ্রভুর আখড়ার দু'টি দেবমূর্তি ২৬ মার্চ '৯৭ তারিখে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ভেঙে ফেলে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও অদ্যবধি সন্ত্রাসীদের কেউ গ্রেফতার হয়নি।

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার ১নং শ্রীকাইল ইউনিয়নের চুলুরিয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা উক্ত এলাকার মৃত সুন্দর আলীর পুত্র মতিন এবং তাঁর সহযোগীদের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার। এই সন্ত্রাসী বাহিনী ১৩.১.৯৭ তারিখে উক্ত এলাকার শংকরচন্দ্র দেবের বাড়িতে আগুন দেয়ার সময় গ্রামের জনসাধারণের কাছে মতিন নামক এক সন্ত্রাসী ধরা পড়ে। পরবর্তীতে সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধভাবে এসে মতিনকে ছিনিয়ে নেয় এবং প্রতিশোধ নিতে উক্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাড়ায় আরও কয়েকবার আগুন দেয়। থানায় মামলা হয়েছে বর্তমানে সন্ত্রাসীদের ভয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে।

২৩ অক্টোবর ৯৭ সকাল বেলা নরসিংদী শহরে শ্রী সঞ্জিতকুমার সাহাকে হত্যা করা হয়েছে। সন্ত্রাসী মজনু মিয়া এবং এন্তা কসাই সঞ্জিতকে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

জয়পুরহাট পাঁচবিবি থানার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। ২২.৪.৯৭ তারিখে দুপুর একটার সময় পাঁচবিবি থানার বড় মানিক ঈদগাহ মাঠের পাশে হাটবারে বাড়ী ফেরার পথে গরীব কৃষক মৃত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের তোজেম মণ্ডলের পুত্র মোত্তালেব কুপিয়ে হত্যা করে। মোত্তালেব উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে দেশত্যাগে বাধ্য করছে। জয়পুরহাট মহাশ্মশানের দক্ষিণ-পূর্ব স্থানের নিয়ম- বহির্ভূতভাবে ব্যাপকহারে বালি ও মাটি কেটে জনৈক আবদস সোবহান তরফদার, পিতা মৃত সলমন তরফদার, খঞ্জনপুর

(বাগানবাড়ি) ব্যপক ক্ষতি সাধন করেছে। তাছাড়া ২২.১১.৯৬ তারিখে মহাশ্মশানস্থ শীতলা মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। একটি কুচক্রীমহল মহাশ্মশান ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এসব করছে বলে মহাশ্মশান কমিটি জানিয়েছে।

ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর থানার দক্ষিণ তারাবুনিয়া গ্রামের মৃত সুরেন্দ্রনাথ সিকদারের পুত্র চিত্তরঞ্জন সিকদার উক্ত এলাকার মছেলউদ্দিন সিকদারের পুত্র আঃ কাদের সিকদার প্রভৃতিদের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার। এ সব নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিকার চেয়ে ইতিপূর্বে রাজাপুর থানায় ৩টি জিডি (নং-৬০৭ তাং ২১.১.৯৬, ১৪৩ তাং ৯.৯.৯৬ এবং ৮৩৬ তাং ৩০.১২.৯৬) করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিকার হয়নি। ২৩.৩.৯৭ তারিখে পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মোঃ কাদের সিকদারের পুত্র আজমল হোসেন বাদল এবং জসীম ওরফে শিমুলসহ কতিপয় সন্ত্রাসী চিত্তরঞ্জন সিকদারের বাড়ীতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা চিত্তরঞ্জন সিকদারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে ।

সন্ত্রাসীরা গত ৬/১০/৯৭ তারিখে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার বাটাজোর গ্রামে সংলগ্ন শৈলকর গ্রামের শ্রী গৌরাঙ্গ হালদারের বাড়ীতে ঢুকে সর্বজনীন পূজা মণ্ডপের দুর্গা মূর্তি ভাঙচুর করে।

বরিশাল জেলার বাউফল থানায় ২৭ অক্টোবর '৯৭ রাতে সন্ত্রাসীরা তিনটি কালীমূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। একটি সদর থানার ওসির বাসভবনের পেছনের মন্দিরে, অপরটি মহেন্দ্র পাগলার আশ্রম মন্দিরে ও অন্যটি দাশপাড়া গ্রামে। মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে ২৮ অক্টোবর, ৯৭ থানার হিন্দু সম্প্রদায় শহরে বিক্ষোভ মিছিল এবং পরে কালীবাড়িতে সমাবেশ করে। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে টিএনও'র কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। থানায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, কেউ গ্রেফতার হয়নি।

বানরীপাড়া থানার মাছরং গ্রামের বিধবা অঞ্জলী রাণী সাহার বাড়িঘর দখলের জন্যে সন্ত্রাসীরা তার ওপর নানা রকম নির্যাতন চালাচ্ছে এবং জীকননাশের হুমকি দিচ্ছে। এব্যাপারে প্রশাসনকে অবহিত করা হলেও প্রশাসন নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করেনি।

১৫.১১.৯৬ শক্রবার ৫০/৫৫ জনের একদল সন্ত্রাসী সকাল নয় টায় বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রহমতপুরের বিশিষ্ট ও ধনাঢ্য ব্যক্তি রামসদয় মুখার্জীর বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে। বিবরণে জানা যায়, রাম সদয়ের জমিতে জনৈক ইজ্জত আলী দীর্ঘ কয়েক বছর যাবং একটি ঘর তৈরি করে দোকান চালাতো, মালিক ঐ জমি ছেড়ে দিতে বললে উজ্জত আলীসহ সন্ত্রাসীরা বাড়িতে আগুন দেয়। ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষাধিক টাকা। ১৪.১২.৯৬ তারিখে বাগেরহাট জেলার সদর থানার যাত্রাপুর শ্রীমান লাউপালা গোপাল মন্দিরের গোপাল বিগ্রহ লুণ্ঠিত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ঐদিন গভীর রাতে মন্দিরের দরজার তালা ভেঙ্গে মূল্যবান মূর্তিসহ অন্যান্য জিনিস নিয়ে যায়। থানায় মামলা হয়েছে।

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানায় ১০ অক্টোবর' ৯৭ বরাতি কামরপাড়া গ্রামে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী পূজা মন্দিরে হামলা চালিয়ে চার টি প্রতিমা ভাংচুর ও লুটপাট করে। তারা মন্দিরে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায় এ ঘটনায় একজন মহিলাসহ ৭ জন আহত হয়। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার রামভাই এর আশ্রম সংলগ্ন 'অপরূপ' ও কলেজ রোডস্থ 'দশভূজা' পূজামণ্ডপের দুর্গা প্রতিমা ১০ অক্টোবর '৯৭ একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। এ ব্যাপারে বেগমগঞ্জে ব্যাপক প্রতিবাদ হলেও কোন সন্ত্রাসী গ্রেফতার হয়নি। লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানার তেতুলিয়া মৌজার কাচারী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ১১.১০.৯৭ তারিখে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ভেঙে ফেলেছে। কোন সন্ত্রাসী অদ্যাবধি গ্রেফতার হয়নি। ২৬.০৯.৯৭ শুক্রবারে সাতক্ষীরার তালা থানার খালিশখালি ইউনিয়নের পল্লীতে উক্ত ইউনিয়নের চেয়্যারম্যান লক্ষীকান্তকে কুপিয়ে জখম করা হয়। ৭.১১.৯৬ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার ঘোষড়া ও খলিষাখালি গ্রামে ২০/২৫ জনের মুখোশধারী একদল সন্ত্রাসী উক্ত এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে বাড়ীঘর লুটপাট করে। সন্ত্রাসীরা উক্ত এলাকার দীনবন্ধু ও অসীম মুখার্জির ঘর-বাড়ির মালামাল লুটপাটের পর তাদের হত্যার হুমকি দেয়।

গোপালগঞ্জ সদর থানার উলিপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী ডিলপুর কালী মন্দিরের বিগ্রহ এবং মন্দির সম্প্রতি দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর করেছে। দুর্বৃত্তরা মন্দিরের জানালার শিক ভেঙে ভেতরে ঢুকে কালী মূর্তির দুটি হাত, জিহবা, মহাদেবের হাত ও পূজার ঘটগুলো ভেঙে ফেলে এবং মন্দিরের ক্ষতি সাধন করে। এ ব্যাপারে গোপালগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ শহরের রামকৃষ্ণ মিশন সংলগ্ন কালী মন্দিরে ঢুকে কতিপয় সন্ত্রাসী ২৩.১২.৯৬ তারিখে ১৬টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। এ ব্যাপারে শহরের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানায় বাকিলা গ্রামের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মণীন্দ্র সরকারকে সম্প্রতি দুষ্কৃতকারীরা হত্যা করেছে। জানা গেছে, সম্প্রতি দুষ্কৃতিকারীরা ডাঃ মণীন্দ্র সরকারের সম্পত্তি দখলের অভিপ্রায়ে তার বাড়িতে হামলা চালায় এবং তাকে কুপিয়ে হত্যা করে এবং বেশ কয়েকজনকে জখন করে। বর্তমানে ডাঃ মণীন্দ্র সরকারের পরিবার হত্যার হুমকির মুখে অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে।

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন

১৯৬৫ সনের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে সেদিন থেকেই পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি আইন জারি করে। ১৯১৪ সনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জার্মান মিশনের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানে এবং সংরক্ষণকল্পে বৃটিশ সরকার ১৯১৬ সনে The Enemy Mission Act : The Enemy Trading Act এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে একই উদ্দেশ্যে জারিকৃত Defence of India Act এবং এই আইনের অধীনে Defence of India Rules এর ধারণা থেকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি আইনের ধারণা নিয়েছে বলে আইন-বিশেষজ্ঞগণ মনে করে থাকেন।

বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ (The Special Powers Act. 1974) অথবা সন্ত্রাস বিরোধী আইন ১৯৯২ (Anti Terrorism Act, 1992) কে কালো আইন অথবা নিপীড়নমূলক আইন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৫ সনের শত্রু সম্পত্তি আইনকে তাহলে কি বলা হবে? নিঃসন্দেহে অমানবিক আইন, কালো আইন।

পাক ভারত যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল ১৭ দিন। যুদ্ধ শুরুর দিন অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ১৯৬২ সনের সংবিধানের ১ ও ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা অনুযায়ী তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সমগ্র দেশব্যাপি জরুরী অবস্থা জারী করে। এই সঙ্গে তিনি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫ Defence of Pakistan Ordinance (ordinance No. 23, 1955) জারি করেন এবং এই অধ্যাদেশের ক্ষমতা বলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি ১৯৬৫ (Defence of Pakistan Rules, 1965) ঘোষণা করেন। উক্ত প্রতিরক্ষা বিধির ১৬১ নম্বর বিধানে 'শত্রু' এবং ১৬৯ নম্বর বিধানে 'শত্রু সম্পত্তি'-র সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যিনি বা যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ বা শত্রুদেশে বসবাস বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে, তাদেরকে 'শত্রু' বলা হয়েছে এবং এই শত্রুদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি বা শত্রু কবলিত মালিকানাধীন বা ব্যবস্থাপনায় ছিল বা আছে সেই সব সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই প্রতিরক্ষা বিধির ১৮২ নম্বর বিধান অনুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একজন কাস্টডিয়ান (Custodion) প্রাদেশিক সরকারের অধীনে একজন করে উপকাস্টডিয়ান (Deputy Custodion) এবং প্রতিটি জেলায় একজন করে সহকারী কামডিয়ান (Assistant Custodion) নিয়োগের কথা উল্লেখ রয়েছে।

এই বিধান বলে আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অগণিত হিন্দু সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তিতে রূপান্তর করা হয়। এই প্রসঙ্গে ২৮ ডি এল আর (১৯৭৬) থেকে একটি

উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। নরেশচন্দ্র নন্দী বনাম ঢাকার জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য এই মামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে উক্ত গ্রন্থের ৪৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে –

Before an Enemy Property is declared to be in unlawful Possession of a Person the latter must be served with notice to the effect that he is in unlawful Possession of the Property in question and ask him to show cause why he should not be ejected and uopn hearing him, if he appears, the order of ejecting him is to be passed with out such notice the order passed against him not be a valid order.

শত্রু সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করার আগে নোটিশ জারির বিধান থাকা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন প্রকার নোটিশ জারি করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে নোটিশ ইস্যু করা হলেও প্রাপকের হাতে পৌছায় না– অসৎ কর্মচারীদের যোগ-সাজশে। অফিস থেকেই গায়েব করে ফেলা হয়।

তাসখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে সতর দিনের মাথায় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ঘটলেও শত্রু সম্পত্তি আইন বহাল রাখা হয়। ১৯৬৯ সনে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও প্রতিরক্ষা বিধিসমূহ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। কিন্তু The Enemy Property Continuance of Emergency-Provision ordidnance 1969 (ordinance No 1, 1969) নামের একটি নতুন অধ্যাদেশ জারি করে শত্রু সম্পত্তি আইন বহাল রাখা হয়।

স্বাধীনতার পর ২৬.০৩.১৯৭২ তারিখে, Bangladesh vesting of Property and Assets order (29) 1972 নামে একটি আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশ বলে পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে শত্রু সম্পত্তিও সরকারি ব্যবস্থাধীনে নেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের এই আদেশের ফলে ১৯৬৯ সনের পাকিস্তান সরকারের ১ নম্বর আদেশটিও যথারীতি বহাল থাকে। পাকিস্তান আমলের শত্রু সম্পত্তি বাংলাদেশ আমলে অর্পিত সম্পত্তি নামকরণ করা হয় মাত্র। কিন্তু শত্রু সম্পত্তির সব রকম বিধিই বলবৎ থেকে যায়।

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীর ২৬ নং আর্টিক্যালে 'মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল'; ২৭ নং আর্টিক্যালে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' এবং ২৮ নং আর্টিক্যালে 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য না করা' সংক্রান্ত বিধানাবলী লিপিবদ্ধ থাকার পরেও এ পর্যন্ত ১২টি সংশোধনী আনা সত্ত্বেও এই শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি আইন কেন বলবৎ রয়েছে তা এদেশের সচেতন নাগরিকবৃন্দের প্রশ্ন। এই আইন কি বলবৎ রাখা হয়েছে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল, হিন্দুদের নির্যাতন অত্যাচার করে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ? কারণ দেশের সংবিধানের উক্ত আর্টিক্যালসমূহ কার্যকর থাকা অবস্থায় শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি আইন বহাল থাকার অর্থই হচ্ছে সংবিধান পরিপন্থী একটি আইন বহাল রাখা। সংবিধানের

প্রতি পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকলে এই কালো আইনটি আর এক মুহূর্তও বলবৎ থাকা উচিত নয়।

১৯৭৪ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার The Enemy Property [Continuance of Emergency Provision (Repeal) Act] তথা Act XLV of 1974 এবং The Vested and-Resident Property (Administration) Act XLVI of 1974-নামে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে দু'টি আইন প্রবর্তন করেন। Act XLVI of 1974 বাতিল তথা প্রত্যাহার সংক্রান্ত আইনটি প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সরকারের সদিচ্ছার অভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে Act XLVI of 1974-বুনিয়াদে এ সমস্ত শত্রু সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত হয় এবং ঐ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত না হয়ে অর্পিত সম্পত্তি হিসেব পরিচিতি লাভ করে। একই সঙ্গে এই আইন ২৩.০৪.১৯৭৪ হতে অতীত কার্যক্ষমতা সহ সংসদীয় আইনে পরিণত হয়। এই আইনের সূত্র ধরে ২৭.১১.১৯৭৬ তারিখে তৎকালীন সরকার The Vested and Non-Resident Property (Administration) (Repeal) ordinance 1976 (ordinance no. 92 of 1976)-জারি করে। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে Act XLVI of 1974 প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং The Enemy Property Continuance Emergency provision (Repeal) (Amendment) ordinance no. 93 of 1976-জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ জারি করে Act XLVI of 1974 সংশোধন করা হয়। এই অধ্যাদেশ জারি করে অর্পিত সম্পত্তি পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও হস্তান্তরের ক্ষমতা সরকার নিজের হাতে তুলে নেয়। আর ১৯৭৬ সনের এই সংশোধনীর মাধ্যমে হিন্দু পারিবারিক উত্তরাধিকার আইনের শ্বাসরোধ করা হয়েছে। কারণ এই সংশোধনীর ফলে সরকার অর্পিত সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তির মতো ব্যবহারের ক্ষমতা লাভ করে। ফলে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় এই অর্পিত সম্পত্তি আইনের বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল করে নেয়ার আরো ব্যাপক সুবিধা পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে যায়। তার উপর এই ৯৩ নম্বর অধ্যাদেশ জারি করার পর ২৩.০৫.১৯৭৭ তারিখে সরকারের ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ ১/ক-১/৭৭/১/৫৬ আর এল সম্বলিত একটি নোটিশ জারি করে। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত এই নোটিশের ৩৭ এবং ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ নিজ নিজ এলাকার বিনা তালিকাভুক্ত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি খুজে বের করার জন্যে এডিসি (রাজস্ব) থেকে শুরু করে তহশিলদার পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করে। এই পুরস্কার জেতার জন্যে এসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শুরু হয় অবৈধ প্রতিযোগিতা। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আরো বেশী করে হয়রানি, দুর্ভোগ ও দুর্দশা নেমে আসে। অত্যাচারিত হিন্দু সম্প্রদায় ১৯৮০ সনে গঠন করেন 'অর্পিত হিন্দু সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ পরিষদ'। সীমিত পরিসরে হলেও এই সংগঠন তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৩১.০৭.১৯৮৪ তারিখে শিল্পকলা একাডেমিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঘোষণা করেন, এরপর থেকে আর কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হবে না। ১৯৮৯ সনের ১৮ জুলাই জেনারেল এরশাদ তাঁর এই ঘোষণা পুর্নব্যক্ত করেন মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে। তাঁর এই ঘোষণা যে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি তার অসংখ্য নজির রয়েছে। জেনারেল এরশাদের এই ঘোষণার পর আগের তারিখ দিয়ে শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি দেখানো হয়েছে এবং কিছুদিন পর পূর্বের নিয়মেই সবকিছু করেছে অসৎ কর্মকর্তা কর্মচারীরা। এই কালো আইনের আওতায় তহশীলদার থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা পর্যন্ত সারাদেশে যে কি পরিমাণ অবিচার অনাচার স্বেচ্ছাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে ৩১ ডি এল আর (১৯৭৬) এর ৩৪৩ পৃষ্ঠায় বকুলরানী সেনগুপ্তা এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্যতে তার বিবরণ রয়েছে। বকুলরানী সেনগুপ্তার মামলার রায় উদাহরণ মাত্র। সারাদেশে এরকম ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে প্রতিনিয়ত।

তার উপর ১৯৯২ সনে সরকার লুকায়িত শত্রু সম্পত্তি খুঁজে বের করার নামে নোটিশ জারির ব্যবস্থা করে। এই নোটিশ জারি করে সরকার হাজার হাজার হিন্দু পরিবারকে নতুন করে হয়রানি করছে। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় দুই থেকে তিনশ হিন্দুর উপর এই নোটিশ ইস্যু করা হয়। এই সব নোটিশে জানতে চাওয়া হয় কেন তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করা হবে না। সরকারের এই নোটিশ জারির অর্থ হচ্ছে নাগরিক অধিকারের প্রতি হুমকি। পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করে আসা সম্পত্তির মালিকানা বিনা কারণে সরকার কর্তৃক কেড়ে নেয়ার জন্যে মালিককে নোটিশ বা হুমকি।

শত্রু সম্পত্তি আইন বাংলাদেশের হিন্দুদের অত্যাচারের একটি স্বীকৃত আইন। এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিটি নাগরিক এই আইনের খড়গের ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত। এই আইন দ্বারা পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি, জোতজমি ছাড়াও দখল করা হয় দেবোত্তর সম্পত্তি এবং শ্মশানঘাট। এই আইন তুলে নেয়া হলে এদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এই আইন তুলে নেয়ার সহায়ক যুক্তি সমুহ এরকম –

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। ১৯৬৫ সালে ভারত ছিল পাকিস্তানের শত্রু। কিন্তু ভারত কি এখনো বাংলাদেশের শত্রু? ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল, সার্ক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ভারত-বাংলাদেশ এবং এই দেশ দুটি সাপটা চুক্তি বাস্তবায়নের সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ। এরপরেও ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার প্রেক্ষাপটে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তা এই বন্ধুপ্রতিম ভারত-বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি আদৌ থাকা সঙ্গত? তাছাড়া শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন মৌলিক অধিকার, মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং এই আইন বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারেরও পরিপন্থী।

অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা এদেশের লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে করা হয়েছে, হচ্ছে নির্যাতন নিপীড়িন। তাদের বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সেই অসংখ্য নির্যাতনের কাহিনী থেকে দু'টি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করব। এই ঘটনা দু'টি সরজমিনে তদন্ত করে ০৮.০৭.১৯৯৫ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল-

কাজীখোলার মায়ারানী সাহা এক একর ৫৮ শতাংশ বসত জমি সরকার থেকে প্রথম লীজ নেন ১৯৭২ সালে। এই ভিটার উপর লাল ইটের একটি বড় দালান রয়েছে। পুরোটাই অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত। মায়ারানীর মামা উপেন্দ্রনারায়ণ সাহা ছিলেন এই সম্পত্তির মালিক। ব্রিটিশ আমল থেকেই তিনি কলকাতায় আসা যাওয়া করতেন। পাকিস্তান আমলে তিনি স্থায়ীভাবে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। যাওয়ার সময় সম্পত্তির 'পাওয়ার অব এটর্নি' দিয়ে যান মায়ারানী সাহাকে। কিন্তু ৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধের পর ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস এর অধীনে শত্রু সম্পত্তি আইনের ধারায় উপেন্দ্রনারায়ণ সাহার সমস্ত সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। '৭২ সালের পর থেকে বছর বছর লীজ নবায়নের মাধ্যমে মায়ারানী সাহা তার স্বামী পরিবারসহ এই ভিটেমাটিতে বসবাস করে আসছেন, গত বছরখানেক ধরে তিনি লীজ নবায়ন করতে পারেননি। এরমধ্যে থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাকে কোন রকম নোটিশ না দিয়ে লীজ বাতিল করে দেন। এক ব্যক্তিকে নতুন ভাবে এই সম্পত্তি লীজ দেয়া হয়। এর পরই উক্ত ব্যক্তি দলবল নিয়ে গত ঈদুল ফিতরের কয়েক দিন আগে জোরপূর্বক মায়ারানীকে উৎখাত করেন তার ভিটেমাটি থেকে। দখল করে নেন পুরো সম্পত্তি। ঘটনার বিবরণ দেন মায়া রানী, 'ওদের ভয়ে আমি তিনদিন দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছিলাম। আমার স্বামী পরিতোষ সাহা তখন ঘরে ছিলেন না। অসুস্থ থাকায় আমাকে স্যালাইন দেয়া হয়েছিল। দরজা ভেঙ্গে তারা ঘরে ঢুকে। জিনিসপত্র তছনছ করে। দুর্গা মন্দিরের ভিটা ভেঙ্গে ফেলে। এরপরে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফেরার পরে দেখি আমাকে আমার দেবরের ঘরে রেখে গেছে।'

ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। লীজ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাজীখোলার (থানা হরিরামপুর, জেলা মানিকগঞ্জ) একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। থানার এক প্রভাবশালী বি এন পি নেতা যিনি জাতীয় পার্টির আমলে উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি উক্ত ব্যক্তির আত্মীয়। এই প্রভাবশালী নেতার প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে উক্ত ব্যক্তি নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে চলছেন মায়ারানী এবং তাঁর পরিবারকে। মায়ারানী সাহার স্বামী পরিতোষ সাহা (ভোম্বল সাহা) জানান, বসতভিটা দখলের সপ্তাহ খানেক পর ওরা এলাকায় বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে। তারপর থানায় গিয়ে আমাকেই বোমা হামলার জন্যে দায়ী করে জিডি করে। কিন্তু গ্রাম্য সালিশে সবাই বোমা হামলায় জন্যে আলোচ্য ব্যক্তির পিতাকে অভিযুক্ত করেন। সালিশে তার ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি জরিমানার টাকা তো দেনইনি, উল্টো থানায় গিয়ে আমার নামে মামলা করেন। আমার ভাই নারায়ণকে তার লোকজন

মারধর করে। বাস্তচ্যুত পরিতোষ সাহা এবং মায়ারানী এখন ছেলেমেয়েসহ বাস করছেন তাদের ছোট ভাইয়ের ঘরে।'

পত্রিকাটির একই সংখ্যায় আরো একটি কেস স্টাডি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত কেস স্টাডি হুবহু এখানে তুলে দেয়া হলো– আরিচার বেলায়েত হোসেন জুনিয়র হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুনীল নাথ তিন একর ১৯ শতাংশ সম্পত্তি কেনেন মনোতোষ নাথের কাছ থেকে। সেটা '৭৯ সালের ঘটনা। সম্পত্তি বিক্রি করে মনোতোষ নাথ ভারতে চলে যান। ৭ বছর ধরে খাজনা দিয়ে সম্পত্তি ভোগ করার পর ৮৬ সালে হঠাৎ করে থানা ভূমি অফিস থেকে নোটিশ পেলেন সুনীল নাথ। জানলেন তার ক্রয় করা ৩ একর ১৯ শতাংশ জমির পুরোটাই অর্পিত সম্পত্তি। সুনীল নাথ বললেন, 'কিভাবে এই সম্পত্তি সরকার অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করলেন তা আমি এখনও বুঝতে পারি না। যার কাছ থেকে আমি এই জমি ক্রয় করি সেই মনোতোষ নাথ উত্তরাধিকার সূত্রে তার ঠাকুরদা দ্বীনবন্ধু নাথের কাছ থেকে এসব সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন। কাজেই তার সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণার বিষয়টি বিস্ময়কর। ৮৬ সালে সুনীল নাথ তার ক্রয় করা সম্পত্তির দখল থেকে উৎখাত হন। সুনীল নাথ খালেক এবং তার সহযোগীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সুনীল নাথ অভিযোগ করেন, সাত্তার এবং কেতাব আলী নামে দুই ব্যক্তি তার প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। তাদের এসব আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জমির ওপর তাদের দখলকে নিস্কন্টক রাখা।

এছাড়াও দৈনিক 'ভোরের কাগজ' ০২ ও ০৩ এপ্রিল '৯৮ এ সম্পর্কে যে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তা এরকম –

'অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারাত্মক প্রভাবে গত তিন দশকে আনুমানিক ১০ লাখ সংখ্যালঘু (হিন্দু ধর্মাবলম্বী) বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে। তাদের হারানো জমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লাখ ৪০ হাজার একর। এই জমি দেশের মোট আয়তনের পাঁচ ভাগের এক ভাগের সমান। বর্তমান বাজার মূল্যে প্রতি শতাংশ ৩৬১৩ টাকা ধরলে এই জমির মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। এই অর্থ দেশের মোট জিডিপি'র অর্ধেক ও বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় পাঁচগুণ বেশি। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-৯৭ সালে এডিপি ছিল ১২ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাত ও সহযোগী অধ্যাপক শফিকউজজামান পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গবেষকদ্বয় হিন্দুধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে ১৯৬৫ সালে প্রণীত শত্রু সম্পত্তি আইনের কুপ্রভাব কার্যকরভাবে প্রমাণ করতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে দেশের ১৬টি জেলার ১৬টি ইউনিয়নের ৪৫০টি হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেন।

তারা দাবি করেন যে, গত তিন দশকে শত্রু সম্পত্তি ও অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের বিষাক্ত ছোবলে এ দেশের এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত জমি হারানোর পরিমাণ বাস্তবে ২০ লাখ একরেরও বেশি হতে পারে। তবে ১৬ লাখ ৪০ হাজার একর জমি হারানোর সমর্থনে সরকারের তহসিল অফিসের দলিলপত্রে উপযুক্ত প্রমাণাদি রয়েছে। গবেষকদ্বয় অনতিবিলম্বে বিদ্যমান অর্পিত সম্পত্তি আইনকে শাসনতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে তা বিলুপ্ত করার জোরালো সুপারিশ করেন। তারা বলেন, এ লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন সরকারকে সর্বপ্রথম এ সংক্রান্ত সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন সাপেক্ষে তা সমাধানে আন্তরিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে।

২৩ পৃষ্ঠার এই সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়, শত্রু সম্পত্তি আইনের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমি হারানোর শতকরা ৭৫ ভাগ ঘটনা ঘটেছে ১৯৬৫ থেকে ৭১ সালের মধ্যে। স্বাধীন বাংলাদেশে বেশিরভাগ সংখ্যালঘু জমি হারায় ১৯৭৫-৯০ পর্বে। এভাবে জমি ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাচক্রে গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর স্থানীয় প্রভাবশালী ও ভূমি কর্মকর্তারাই বরাবর মুখ্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। সর্বোপরি থেকেছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের তরফে সব রকম প্রশ্রয়।

সমীক্ষায় সংখ্যালঘুদের জমির অতীত ও বর্তমান সুবিধাভোগকারীদের রাজনৈতিক শ্রেণী চিহ্নিত করে বলা হয়, জমি ভোগকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (৪৪ শতাংশ) ১৯৬৫-৭১ পর্বে ছিল মুসলিম লীগের । কিন্তু ১৯৯৬ সালে দেখা গেছে এককভাবে জমির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগকারীরা (৪৪ শতাংশ) ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরপরেই রয়েছে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র অবস্থান। এদের হাতে রয়েছে শতকরা ৩২ ভাগ জমি। সমীক্ষা রিপোর্টে অবশ্য সংখ্যালঘুদের হারানো মোট জমির শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ বর্তমানে সম্মিলিতভাবে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ তরিকার লোকজনের কুক্ষিগত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

সমীক্ষার আওতাধীন ১৬টি জেলাভুক্ত ৪৫০টি হিন্দু পরিবার সম্পর্কে বলা হয়, তারা গত তিন দশকে শত্রু সম্পত্তি ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের শিকার হয়ে প্রত্যেকে গড়ে (২ একর ১৯ শতাংশ) জমি হারিয়েছে। প্রতি শতাংশ জমির বর্তমান বাজার মূল্য ৩৬১৩ টাকা। এই হিসেবে গড়ে এদের একেকটি পরিবারের ক্ষতি হয়েছে ৭ লাখ ৯১ হাজার ২৪৭ টাকা ৪৫০টি পরিবারের মোট ক্ষতি হয়েছে ৭ লাখ ৯১ হাজার ২৪৭ টাকা। ৪৫০টি পরিবারের মোট ক্ষতি দাঁড়াবে ৩৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এই ৪৫০টি পরিবারের শতকরা ৭৮ ভাগ গড়ে (১ একর ৮২ শতাংশ) কৃষি জমি, শতকরা ৬০ ভাগ গড়ে ২৩ শতাংশ আবাসিক জমি ও শতকরা ২০ ভাগ গড়ে ১৪ শতাংশ অন্য প্রকৃতির জমি হারিয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, স্থানীয় প্রভাবশালী ও তহসিল অফিসের যোগসাজশে সংখ্যালঘুদের জমি আত্মসাতের ঘটনা ১৯৭২-৭৫ পর্বে সবচেয়ে কম ঘটেছে। তবে তা ছিল সমগ্র ঘটনার প্রায় ১০ ভাগ এবং জমি বেদখলের ক্ষেত্রে ৭ ভাগ।

অর্পিত বা কায়েমি হিসেবে ঘোষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আশায় অনেক সংখ্যালঘু পরিবার আইনের আশ্রয় নিয়ে করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে। জমি-জিরাতসহ সর্বস্ব বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে গেছে তারা।

অধ্যাপক আবুল বারকাত ও সহযোগী অধ্যাপক শফিকউজ্জামান পরিচালিত সমীক্ষায় অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে এককালের অবস্থাপন্ন সংখ্যালঘু পরিবার পরবর্তী সময়ে কিভাবে নিঃস্ব হয়ে গেছে তার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ৪৫০টি পরিবারের মধ্যে ১১৪টি তাদের জমিজিরাত বিলকুল বিক্রি করেছে। এই ১১৪টি পরিবার সম্মিলিতভাবে কৃষি ও বাসযোগ্যসহ মোট ২৬ হাজার ৫৩ শতাংশ জমি বিক্রি করে। অন্য কথায়, তারা অর্পিত সম্পত্তি আইনের শিকার হয়ে প্রত্যেকে গড়ে ৫৮ শতাংশ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এতে বর্তমান বাজারমূল্য পরিবার প্রতি ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ৯ হাজার ৫৫৪ টাকা। যেসব এলাকায় জরিপ ও সমীক্ষার রিপোর্ট তৈরি করা হয় সেসব এলাকার অভিজ্ঞমহল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মত দিয়েছেন যে, যতোদিন অর্পিত সম্পত্তি আইন বলবৎ থাকবে ততোদিন সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর দেশত্যাগের চাপ অব্যাহত থাকবে।

.... রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে 'নিখোঁজ' হিন্দুর মোট সংখ্যা ৫০ লাখ ৩০ হাজার। এর অর্থ হচ্ছে, ১৯৬৪ সাল থেকে প্রতিবছর এক লাখ ৮৬ হাজার ২৯৬ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক এদেশ থেকে নিখোঁজ হয়েছে। অন্যকথায়, যদি প্রধানত শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব মুখ্য কারণ হয় তবে বলতে হবে, ১৯৬৪ সাল থেকে প্রতিদিন গড়ে আনুমানিক ৫৩৮ জন সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করেছে। দেশত্যাগের এই পরিসংখ্যান গত তিন দশকের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে ওঠানামা করেছে। উদারহণস্বরূপ ১৯৬৪-৭১ পর্বে প্রতিদিন গড়ে সর্বোচ্চ ৭০৩ জন, ১৯৭১-৮১ পর্বে দৈনিক গড়ে ৫৩৭ জন ও ১৯৮১-৯১ পর্বে প্রতিদিন গড়ে ৪৩৯ জন দেশত্যাগ করেছে বলে অনুমান করা যায়।'

উল্লেখ্য যে, সরকারি হিসেবে সারাদেশে ৭০২৩৩৫ একর জমি এবং ২২৮৩৫টি বাড়ি শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির তালিকায় রয়েছে। এরমধ্যে ৩৮৯১৯৭ একর জমি এবং ১৩৪৩২টি বাড়ি সরকারের বেদখলে রয়েছে। এ সংক্রান্ত ৫৭৫টি মামলা ঢাকা বিভাগে ২৩০টি চট্টগ্রাম বিভাগে ৩১২টি রাজশাহী বিভাগে ২৯২টি বরিশাল এবং ৭৪টি সিলেট বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।

সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ৭ লাখ ২ হাজার ৩৩৫ একর জমি এবং ২২ হাজার ৮৩৫টি বাড়ি শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভূক্ত রয়েছে। সরকারের এই তালিকার বাইরেও বহু জমি ও বাড়ি শত্রু সম্পত্তির নামে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল জবর দখল করে রেখেছে। সরকারী তালিকাভূক্ত সব জমি ও বাড়ি আবার সরকারের দখলে নেই, শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভূক্ত ৩ লাখ ৮৯ হাজার ১৯৭ একর জমি এবং ১৩

হাজার ৪৩২টি বাড়ি সরকারের বেদখলে রয়েছে। এ নিয়ে ১ হাজার ৮৭৯টি মামলা সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সরকার হিন্দুদের যে সব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে তার উল্লেখযোগ্য অংশের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে বসবাসকারী বহু হিন্দু নাগরিকের বিষয় সম্পত্তি উদ্দেশ্য মূলকভাবে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ সব সম্পত্তির মালিকদের কেউ কেউ প্রশাসনিক এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আবার যাদের সে ক্ষমতা নেই তারা নীরবে দেশত্যাগ করে চলে গেছেন, চলে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে এমন কোন গ্রাম বা শহর নেই যেখানে শত্রু সম্পত্তি আইন তথা এই কালো আইনের অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ হয়নি।

শত্রু সম্পত্তি আইন তুলে দেবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সদি চ্ছার হয়তো কোন অভাব নেই। কিন্তু তাঁর প্রশাসন ও সরকার এ ব্যাপারে কতটা আন্তরিক ? এ প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরুর জাতীয় সংসদে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন পুরোপুরি বাতিল করলে দেশে বিশৃংখলা দেখা দেবে। আইনটি বাতিল বা সংশোধনের আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আইন কমিশনে পাঠানো হবে।' (দেখুন ঃ দৈনিক সংবাদ, ০৪ মার্চ ১৯৯৭)। স্বয়ং আইনমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে শত্রু সম্পত্তি আইন খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করা হচ্ছে না।

আবার আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশারফ জামাতে ইসলামীর সাংসদ দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর এক প্রশ্নের জবাবে জাতীয় সংসদে বলেছেন, 'অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই'। (দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক সংবাদ ১৭.০৬.১৯৯৭।

শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করার বিষয়টি আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। শেখ হাসিনা সরকার যদি এই কালো আইনটি বাতিল করার ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হয়ে থাকেন তাহলে আইন কমিশনের দ্বারস্থ না হয়ে দেশের আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দ্রুত একটি কমিটি গঠন করে এই বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাব বা সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদে আইনটি বাতিল করা যায়। এই আইনটি বাতিলের ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে একাই কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাতের কাছ থেকে আইনটি বাতিলের ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যাবে না। এদের সমর্থক পত্রপত্রিকাগুলো সেভাবেই লিখে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগকে উদ্যোগ নিতে হবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেই এই কালো আইনটি বাতিল করার। আর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এককভাবে আওয়ামী লীগের রয়েছে।

একই দেশের নাগরিকদের জন্য দু'রকম আইন এটা আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সে কথা মনে রেখে শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনটির মত একটি কালাকানুন অচিরেই শেখ হাসিনার সরকার বাতিল করবে, এটা প্রত্যাশা করছি।

॥ ৪ ॥

দেবোত্তর সম্পত্তি দখল

দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রি করার কোন নিয়ম নেই। নেই কোন আইন, বরং এই সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবুও এক শ্রেণীর লোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা প্রভাবশালী এই আইনকে অমান্য করে হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে। দখল করার আগে অথবা পরে ভূয়া দলিল প্রদর্শন করে এই দখলদার গোষ্ঠী। দেশে যে সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে সে সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট একটি চক্র এই সম্পত্তি দখল করেছে সবচে বেশী। বলাবাহুল্য দখলের এই অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে– দেশের প্রতিটি জেলায়।

ঢাকা শহরের হিন্দু সম্প্রদায় দেশের অন্যান্য এলাকার হিন্দুদের তুলনায় কিছুটা নিরাপদ মনে করেন– এরকম কথাই প্রচলিত রয়েছে। এই নিরাপদ ঢাকা শহরের দেবোত্তর সম্পত্তির কি অবস্থা তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেয়া হলো। সমগ্র দেশের তালিকা দিতে গেলে আলাদা একটি বই অনায়াসে লেখা যাবে।

ঢাকা শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান মিলনকেন্দ্র ঢাকেশ্বরী মন্দির । এই মন্দিরটির উপর বিভিন্ন সময়ে এসেছে হামলা, ধ্বংস করা হয়েছে প্রতিমা, লুট করা হয়েছে মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রী। বি.এন.পি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নিজস্ব জায়গায়, মন্দিরের গা ঘেঁষে তাদের লালবাগ অঞ্চলের একটি অফিস করেছে। মন্দিরের অন্যান্য অনেক জায়গাও দখল করার চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা শহরের রায়ের বাজার এক সময়ের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। এখনো এই রাজধানী শহরের যে সব এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিক বসবাস করেন তার মধ্যে রায়ের বাজার এলাকা অন্যতম। রায়ের বাজারের পালদের গদি ঘরের মন্দিরের সম্পূর্ন জায়গা 'বৈশাখী যুব সংগঠন' নামে একটি সংগঠনের দখলে। এই সংগঠনটির মূল নেতা জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জনৈক আনোয়ার হোসেন। গদি ঘর মন্দির কম্পাউন্ডে তিনটি মন্দির ছিল কালী মন্দির, দুর্গা মন্দির ও লক্ষ্মী মন্দির। বি এন পির এই নেতা বৈশাখী যুব সংগঠনের নামে এই তিনটি মন্দিরের ইমারত ও খালি জায়গা দখল করে নিয়েছে। পালদের গদি ঘরের মন্দিরের শুধু জায়গার মূল্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। আনোয়ার হোসেন তার দল নিয়ে মন্দির দখল করার পর প্রথম যে কাজটি করেছে তা হচ্ছে মন্দিরের প্রতিমাগুলো মন্দির এলাকার বাইরে ছুঁড়ে ফেলা।

খতিয়ান ৫ দাগ ২২১ মৌজা সরাই জাফরাবাদ হোল্ডিং ৩২১- এই সম্পত্তির মালিক শ্রীশ্রী কালীমন্দির। এই মন্দিরটি পুলপাড়ের মন্দির নামে সমধিক পরিচিত। উক্ত দাগ নম্বরে মন্দিরের জায়গার পরিমান তিন কাঠা। কিন্তু ৩২২/ ২ জাফরাবাদের রওশন আরা

বেগম এই কালী মন্দিরের এক কাঠার উপরে জায়গা দখল করে নিজের বাড়ির সঙ্গে এক করে দেয়াল তুলেছে। রওশন আরা বেগমের দখলীকৃত এই এক কাঠা জায়গার বর্তমান বাজার মুল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই কালী মন্দিরটির বাকি জায়গাও দখল করার চক্রান্ত করা হচ্ছে, জানিয়েছেন উক্ত মন্দির কমিটির সহসভাপতি সমরেশচন্দ্র পাল।

বারো বছর পূর্ণ হবার আগে কোন হিন্দু শিশু মারা গেলে তাকে মাটি গর্ত করে সমাহিত করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু রায়ের বাজার জাফরাবাদ শ্মশানে কোন শিশুকে কবর দিতে দিচ্ছে না ২৮ নং জাফরাবাদের অধিবাসী এডভোকেট মোহাম্মদ আলী খান পিতা ইসমাইল খাঁ ওরফে টোকানী। উক্ত মোহাম্মদ আলী খান শ্মশানঘাটটি দখল করার উদ্দেশ্যে শ্মশানের যাতায়াতের রাস্তাটিও দখল করে নিয়েছে।

পুরান ঢাকার টিপু সুলতান রোডের রাধাবিনোদ জিউর মন্দিরের সম্পূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে মানিকগঞ্জ জেলার বি এন পির সভাপতি মোঃ আবদুর রাজ্জাক।

লালবাগের সারঙ্গধর রঘুনাথজী মন্দিরটি দখল করার উদ্দেশ্যে কিছুদিন আগে হামলা করেছে স্থানীয় বি এন পি নেতা হাজী মোঃ সেলিম (বর্তমানে আওয়ামী দলীয় সাংসদ)। হামলা করার সময় সে মন্দিরের সম্পূর্ণ জায়গা ক্রয় করেছে বলে দাবী করে। অথচ সামান্য লেখাপড়া জানা লোকও জানেন, মন্দিরের জায়গা দেবোত্তর সম্পত্তি যা কেনাবেচার অধিকার কারো নেই।

শ্রীরুদ্র ত্রিদণ্ডী ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯, স্বামীবাগ রোডে 'স্বামীবাগ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের জমির পরিমাণ প্রায় চার বিঘা। পুরো জায়গাটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আশ্রমে রয়েছে শিব মন্দির, কালী মন্দির, হরগৌরী মন্দির এবং শ্মশান ও মঠ। ১৯৭১-এ এই আশ্রমে হামলা করেছে, আগুন দিয়েছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। ১৯৯২ তে লুট,ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে এদেশের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। স্বামীবাগ আশ্রমের পুরো সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি। এই চার বিঘা জমির বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় চার কোটি টাকা। স্বামীবাগ আশ্রমের এই জমি দখল করার উদ্দেশ্যে খলিলুর রহমান বিশ্বাস, পিতা মিলাপ বক্স বিশ্বাস সাং সুমিরদিয়া, থানা ও জেলা চুয়াডাঙ্গা– একটি দলিল প্রদর্শন করেছে। দলিলের ভাষ্যানুযায়ী উক্ত খলিলুর রহমানের পিতা ২৮ ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রঃ ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীর নিকট থেকে এই চার বিঘা জমি কিনেছিলো। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এই জমি রেজিষ্ট্রি হয়েছিল উল্লেখিত তারিখে। দলিল নম্বর ৫৮৪১। কিন্তু স্বামীবাগ আশ্রমের সেবায়েত শ্রী যশোদানন্দন আচার্য কৃষ্ণনগর রেজিষ্ট্রি অফিসে নিয়ম মাফিক খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছেন উক্ত নম্বরের দলিলটি মিলাপ বক্স বিশ্বাসের নামে করা হয়নি। ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১৫০ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি স্বামীবাগ আশ্রমের বরাবর এই চার বিঘা জমি দান করেছিলেন। সে দানপত্রের মূল কপি আশ্রমের সেবায়েতের নিকট রক্ষিত রয়েছে। স্বামীবাগ আশ্রমের এই চার বিঘা জমি দখল করার উদ্দেশ্যে আরো একটি নকল দলিল

প্রদর্শন করা হয়েছে। এই দলিলটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ ১৯২৩ -এ পরলোকগমন করেছেন। ১৯২৭ এর যে নকল দলিলটি প্রদর্শন করা হয়েছে সে দলিলে-বিক্রেতা হিসাবে স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে।

এভাবে মৃতব্যক্তির স্বাক্ষর জাল করে অথবা বিভিন্ন রকম ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে জাল দলিল বানিয়ে এদেশের এক শ্রেণীর অসৎ লোক দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে। দখল নেয়ার আগে তারা দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত বা রক্ষকদের নানা রকম ভয়ভীতি, জীবননাশের হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

দেবোত্তর সম্পত্তির কাস্টডিয়ান জেলা জজ। উক্ত সম্পত্তির ভিতরে যে সব মন্দির উপাসনাগার অথবা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে জেলা জজের অনুমতি সাপেক্ষে প্রকৃত সেবায়েত আংশিক জমি বিক্রি করতে পারেন এরকম বিধান রয়েছে। কিন্তু মন্দির বা ধর্মীয় স্থানের উন্নয়নকল্পে এদেশে কোন দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রি করা হয়নি। তবুও সারা দেশের অধিকাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে গেছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্যে দেবোত্তর সম্পত্তির অংশ বিশেষ বিক্রি করার প্রয়োজন পড়ে না এজন্যে যে, এদেশের কোন মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নতুন করে উন্নয়ন হয়েছে এরকম উদাহরণ নেই বললেই চলে। যা হয়েছে সেখানে ব্যক্তিগত দান, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল ব্যয় করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান পাওয়ারও উদাহরণ রয়েছে। যেমন– হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্টের নামে আড়াই কোটি টাকার হিন্দু কল্যাণ তহবিল রয়েছে। যদিও ধর্মীয় খাতে সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে এই পরিমান অর্থ খুবই অপ্রতুল।

দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করার আরো অসংখ্যা অবৈধ পন্থার নজীর রয়েছে। সে সব নজীর এখানে তুলে না ধরে শুধূ একটি প্রস্তাব রাখবো – দেবোত্তর সম্পত্তি দখল এবং দখলকরার যেসব অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং যারা তা করে তাদের জন্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হলেই এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে নির্বিঘ্নে উপাসনা করা সম্ভব।

॥ ৫ ॥

সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের অবস্থান

সরকার প্রয়োজনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর থেকে লিখিত, মৌখিক ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্যে কর্মকর্তা নির্বাচিত করে নিয়োগদান করে থাকে। কিন্তু দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিতের হার শতকরা চল্লিশোর্দ্ধ হওয়া সত্ত্বে তাদেরকে এই হারে নিয়োগ দেয়া হয় না। এমন কি মোট জনসংখ্যার হারেও হিন্দুদের নিয়োগ দেয়ার কোন নজীর নেই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সবচেয়ে বৈষম্যমূলক পরীক্ষা হচ্ছে মৌখিক পরীক্ষা। মৌখিক পরীক্ষার একটি অঘোষিত নিয়ম রয়েছে হিন্দুদের কম নম্বর দেয়া। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা বি,সি,এস, লিখিত পরীক্ষায় বরাবরই ভাল রেজাল্ট করে থাকেন। লিখিত পরীক্ষায় যদি ২৫% হিন্দু ছেলেমেয়ে পাশ করে তাহলে ভাইভায় তাদের পাশ করানো হয় ২-৩%।

ভাইভায় আর একটি শ্রেণীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। যদি কোন মুসলমান প্রার্থীর বাংলা নাম থাকে তাহলে তাকে এই নাম নিয়েই ভাইভা বোর্ডে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়। বোর্ডের সদস্যরা তার এই বাংলা নাম নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করেন, যা অসৌজন্যমূলক। ১৫তম বি,সি এস মৌখিক পরীক্ষার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। শুভ্রা রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ থেকে পাশ করেছেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড মেডেলও পেয়েছেন। ১৫তম বি, সি, এস, লিখিত পরীক্ষায় তিনি ভাল করেছেন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান,; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক, যিনি পি এস সি'র মেম্বারও তিনিই প্রথম তার শুভ্রা নামটি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। উক্ত বোর্ডের চেয়াম্যানের ভাষ্য হচ্ছে– শুভ্রা নামটি হিন্দু। কিন্তু শুভ্রা রহমান কোন অবস্থাতেই তাকে এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের বোঝাতে পারেননি তার নামটি বাংলা এবং সে বাঙ্গালী মুসলমান। তার বাবার নামের 'রহমান' শব্দটি নিজের নামের সঙ্গে রয়েছে। ভাইভা বোর্ডের মন ও মানসিকতা এতটা সাম্প্রদায়িক যে শুধু শুভ্রা, এই নামটির কারণে শুভ্রা রহমানকে ভাইভায় ফেল করানো হয়েছে। পক্ষান্তরে তার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন আর একজন মেয়েকে ফরেন সার্ভিসের জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। যিনি ফরেন সার্ভিসে নিয়োগ পেয়েছেন সেই মেয়েটির নাম সর্বাংশে ইসলামিক। শুভ্রা রহমান বর্তমানে তার এই মুসলমান বান্ধবীর চেয়ে অনেক বেশী বেতনে ঢাকার ইংরেজী স্কুলগুলোর অন্যতম স্কলাষ্টিকা'য় চাকরি করছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে কোন হিন্দুকে নিয়োগ করা হয়নি। এই কমিশনের মেম্বার পদে স্বাধীনতার স্থপতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসন আমলের পরে আর কোন হিন্দুকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। যদিও যাদেরকে চেয়ারম্যান মেম্বার পদে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সমযোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য অধ্যাপক বা বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আছেন। এমনকি ভাইভা বোর্ডের মেম্বার করার সময় খুব সচেতন ভাবে হিন্দু অধ্যাপকদের বাদ রাখার প্রবণতা রয়েছে। সহযোগী অধ্যাপককে ভাইভা বোর্ডের মেম্বার করা হয়। কিন্তু হিন্দু অধ্যাপককে এই বোর্ডে নেয়া হয় না- এরকম উদাহরণ রয়েছে প্রচুর।

সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মিডটার্ম পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার নিয়ম করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু রোল নম্বর লেখার নিয়ম ছিল। হঠাৎ করে কেন নাম লেখার নিয়ম করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে কি ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার এই তিনটি পদে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দান করে থাকেন। স্বাধীনতার পরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই তিনটি পদে শতাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই শতাধিক ব্যক্তির একজনও হিন্দু নন। বলা বাহুল্য যাদেরকে এ পর্যন্ত এই তিনটি পদে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সমযোগ্যতা বা অধিকযোগ্যতা সম্পন্ন অনেক হিন্দু অধ্যাপক দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন, ছিলেন। এমনকি ভিসি প্যানেলেও কোন হিন্দু অধ্যাপকের প্রতিদ্বন্দিতা করার নজীর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী বা সদস্য পদে স্বাধীনতার পরে কোন হিন্দুকে নিয়োগ করা হয়নি। জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, মেম্বার করার নজীর নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে কোনা গুরুত্বপুর্ণ পদে একজনও হিন্দু নেই। দেশের কোন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে স্বাধীনতার পরে একজন হিন্দুকেও নিয়োগ করা হয়নি।

বাংলাদেশের কোন কর্পোরেশনের প্রধান কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে একজনও হিন্দু নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর বা ডেপুটি গর্ভনর অথবা পরিচালক পদে একজনও হিন্দু নেই। শিল্পব্যাংক, কৃষিব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এই তিনটি গর্ভমেন্ট স্পেশাইলাইজড ব্যাংক। সোনালী, রূপালী, অগ্রণী ও জনতা এই চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এম,ডি কিংবা জি, এম, পদে একজনও হিন্দু নেই। এই চারটি ব্যাংকের মধ্যে সোনালী ব্যাংকে মাত্র একজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানাজার (ডিজিএম) রয়েছেন। তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ব্যাংকের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন একটি পদে । জাতীয়করণকৃত ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলোর কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন হিন্দুকেও নিয়োগ করা হয়নি। হিন্দুদের ব্যাংক ঋণ দেয়ার ব্যাপারেও বিধিনিষেধ সম্বলিত একটি নোটিশ অতি গোপনে মন্ত্রণালয় থেকে বিএনপি আমলে শাখা প্রধানদের সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রে এভাবে হিন্দুদের নাগরিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের বিদেশে কোন রাষ্ট্রদূত বা চার্জ দ্য এফেয়ার্স পদে হিন্দু নেই। সরকারের বিদেশ, স্বররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন হিন্দু অফিসার নেই। এদেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসক পদে একজনও হিন্দু নেই। সচিবালয়ের ৪৬৩টি ডেপুটি সেক্রেটারী পদের মাত্র ২৫ জন হিন্দু উপসচিব রয়েছেন। ৩ জন হিন্দু জয়েন্ট সেক্রেটারী রয়েছেন, ১৩৪ জন জয়েন্ট সেক্রেটারীর মধ্যে। যাঁদের একজন অবসর নিয়েছেন। বাকি দুজন খুব শীঘ্রই অবসর নিতে যাচ্ছেন। সচিবালয়ের ৫০টি সচিবের চেয়ারে একজন হিন্দুকেও বসানো হয়নি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা আমলাদের বৈদেশিক শুভেচ্ছা মিশনে, ট্রেড ডেলিগেশন ও অন্যান্য টীমে হিন্দু নাগরিকদের অনুপস্থিতি খুবই চোখে লাগার মতো। জাতীয় সংসদে মহিলাদের ৩০টি সংরক্ষিত আসনে আজ পর্যন্ত কোন হিন্দু মহিলাকে মনোনীত করা হয়নি। অবশ্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পূর্ববর্তী অবস্থার অনেকটাই অবসান ঘটেছে। যেমন – হিন্দু মহিলা সাংসদ, হিন্দু সচিব ও জেলা প্রশাসক ইত্যাদি রয়েছেন। কিন্তু তাও আনুপাতিক হারে নয়। অবশ্য আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এদেশের সংখ্যালঘুরা মানসিকভাবে নিজেদেরকে অনেকটা সিকিউড বা নিরাপদ বোধ করে। সংখ্যালঘুদের জন্য বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের এটা সবচেয়ে বড় অবদান।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৯০০ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এবং লেফটেন্যান্ট কর্মরত। এই ৯০০ জনের মধ্যে মাত্র তিন জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন। ১৩০০ ক্যাপ্টেনের মধ্যে মাত্র ৮ জন সংখ্যালঘু এবং ৬৫ জন কর্ণেলের মধ্যে মাত্র একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশ আর্মিতে ৬৫ জন বিগ্রেডিয়ার এবং ২২ জন মেজর জেনারেল রয়েছেন। কিন্তু এই পদ দুটিতে একজনও হিন্দু নেই, সেনাবাহিনীর মোট অফিসার সংখ্যা ৩৮০৭ জন। এরমধ্যে ৬২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

বাংলাদেশ পুলিশে আশি হাজার জোয়ান। এর মধ্যে দু হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নেয়া হয়েছে। আই,জি, বা এডিশনাল আই, জি, পদে কোন হিন্দু নেই। আঠার জন ডি আই জির মধ্যে একজন এবং ১২৩ জন এসপি/এ আই জির মধ্যে মাত্র দশজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ৮৭ জন ডি এস পি/ এসিসটেন্ট কমিশনারের মধ্যে মাত্র দুই জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন। চল্লিশ হাজার বি ডি আর জোয়ানের মধ্যে মাত্র ৩০০ জন সংখ্যালঘু।

কাষ্টস্টমস এণ্ড এক্সসাইজ অফিসার পদের সংখ্যা ১৫২ টি, এর মধ্যে মাত্র একজন সংখ্যালঘু অফিসার রয়েছেন। ৪৫০ জন ইনকামট্যাক্স অফিসারের মধ্যে মাত্র সতর জন হিন্দু অফিসার কর্মরত রয়েছেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি এই বৈষম্য বঞ্চনা ও নির্যাতনের পরিকল্পিত ইতিহাস তাদের ভবিষ্যৎকে করে তুলেছে অনিশ্চিত,দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে পরিকল্পিতভাবে করে তোলা হচ্ছে বিজাতীয় এবং শত্রুভাবাপন্ন। মনকে গড়ে তুলছে উদ্বাস্তর চেতনায়। ক্রমেই

হিন্দুরা এদেশে হয়ে পড়ছে পরবাসী। দেশের অনেকগুলো কর্মক্ষেত্র এই সম্প্রদায়ের জন্যে অলিখিত নিয়মেই বন্ধ। হিন্দুরা এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বেচ্ছাসেবী, নির্বাচনে ভোটার মাত্র। দেশশাসনে দর্শক মাত্র। নীতিনির্ধারণে নিষিদ্ধ, অস্তিত্বে অপাংক্তেয়, চাকরিতে নিম্নস্তরের জীব। প্রশাসনে অনাকাঙ্ক্ষিত ও তাচ্ছিল্যের শিকার, সামাজিক জীবনে ভাসমান, নাগরিক ও ধর্মীয় জীবনে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, মনোজগতে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ সংঘাতে যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় এক এক জন পরাজিত সৈন্য হিসেবে তারা পলায়নী মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন। অথচ শিক্ষার হারে, প্রজ্ঞায়, বুদ্ধি বিবেচনায় চিন্তা-শক্তিতে, চারিত্রিক দৃঢ়তায়, দেশপ্রেমে, রাজনৈতিক ত্যাগ তিতিক্ষায় কর্মদক্ষ। আর প্রাচুর্যে, সংযমে, মুক্তি সংগ্রামকারী ত্যাগে, সংস্কৃতিচর্চায় এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় অগ্রনী। মুক্তিযুদ্ধে তাদের ত্যাগ, আত্মনিবেদন, সংখ্যানুপাতের চেয়ে বেশী। এদেশের একজন হিন্দুও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে রাজাকারের ভুমিকা পালন করেছে। তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে কেন এই বৈষম্য ?

এভাবে চলতে থাকলে একদিন দেখা যাবে সামরিক বা বেসামরিক পদেই আর হিন্দুদের খুঁজে পাওয়া যাবে না, মেজর পদে যদিও ৪০ জন অফিসার রয়েছেন। কিন্তু যাদের সাম্প্রতিক কালে রিক্রুট করা হযেছে অর্থাৎ সেকেন্ড লেফটেনেন্ট/ লেফটেনেন্ট পদে মাত্র ৩ জন সংখ্যালঘু অফিসার নেয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে পুলিশ বিভাগে যে ৩০০ জন সাব ইন্সপেক্টর রিক্রুট করা হয়েছে আর মধ্যে একজনও হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিক নেই।

অথচ দেশের সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি রক্ষার্থে প্রশাসনে হিন্দু অফিসার থাকা খুবই জরুরী। বক্তব্যটির আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোন জেলার পুলিশ সুপার অথবা ডিসি যদি হিন্দু থাকেন তাহলে তুলনামূলক ভাবে সে জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে বেশী। উক্ত হিন্দু অফিসারের উপস্থিতিই এই ক্ষেত্র যথেষ্ট। অথবা পি এস সির মেম্বারদের মধ্যে যদি কেউ হিন্দু থাকেন তাহলে মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে তা অনেকাংশে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রেও হিন্দু মেম্বারের উপস্থিতিই যথেষ্ট।

১৯৯৫ সালের অক্টোবরে ২০১ জন সরকারি কর্মকর্তার পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ২৬ জন যুগ্মসচিব অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই ২৬ জনের মধ্যে ২ জন হিন্দু। ৮৩ জন উপসচিব যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই ৮৩ জনের মধ্যে ১১ জন হিন্দু। ৯২ জন পদোন্নতি পেয়েছেন উপসচিব পদে। এই ৯২ জনের মধ্যে ৮ জন হিন্দু। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পরে এতো ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুকে এই প্রথম পদোন্নতি দেয়া হলো। বলাবাহুল্য এবারের পদোন্নতিতে কোন রকম মৌখিক পরীক্ষা বা কোন নম্বরের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কর্মকর্তাদের দশ বছরের এ সি আর গড় করে যারা গড়ে কমপক্ষে ৭৫% পেয়েছেন কেবল তাদেরকেই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

মৌখিক পরীক্ষার নিয়ম তুলে দেয়া হলে প্রকৃত মেধা যাচাই হবে। বৈষম্যের সুযোগ কমে যাবে। এই পদোন্নতি তার অন্যতম উদাহরণ।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সরকারী চাকরিতে প্রমোশন ও পোস্টিং এর ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা হয়েছে। যেমন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একজন হিন্দু সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক করা হয়েছে হিন্দু অফিসারকে। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু নভেম্বর '৯৭ যে ৩৯টি থানা প্রকৌশলী পদে পিএসসি কর্তৃক রিক্রুট করে যাদের নিয়োগ দেয়া হলো তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন সংখ্যালঘু। কালীরঞ্জন কর্মকার নামে জনৈক বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারের শিক্ষাজীবনের সবগুলি প্রথম শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও তাকে নেয়া হয়নি। এটা উদাহরণ মাত্র। আওয়ামী লীগ আসলে খুব সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও প্রশাসনের প্রায় সর্বত্র পূর্বের মতই হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ ও প্রমোশন দেয়া হচ্ছে না।

তবে জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ কর্তৃক বঙ্গভবনে হিন্দুদের রিসেভশন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সরকারের এক কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা বরাদ্দ এবং মহিলাদের জন্য নির্ধারিত সংসদের ত্রিশটি আসনের মধ্যে হিন্দু নাগরিকের মধ্য থেকে এম. পি মনোনীত করায় এদেশের হিন্দুরা তাদের প্রতি কিছুটা হলেও সুবিচার করা হচ্ছে এ রকম বোধ আওয়ামী লীগের্র প্রতি জেগেছে।

॥ ৬ ॥

হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ থেকে মোট কত জন হিন্দু প্রতিদিন দেশ ত্যাগ করছেন তার কোন সরকারি পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় যে দেশত্যাগ করছেন এবং তা যত গোপনেই হোক না কেন সে দেশত্যাগ,তা সূর্যালোকের মতো সত্য। সরকারি মহল এই সত্যকে বরাবরই অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভারতে গিয়ে ১৯৯২ এর জুনে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের কথা স্বীকার করে এসেছেন। কলকাতার পাক্ষিক 'দেশ' (৫৯ বর্ষ,৩৩ সংখ্যা ১৩ জুন ১৯৯২) এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে, 'সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরে এসে এখানে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশের ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও পরে সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন'। 'দেশ' উক্ত সংখ্যায় আরো লিখেছে 'বেসরকারী হিসেবের কথা তুলছি না, আমাদের স্বরাষ্ট্র এবং বিদেশ মন্ত্রকের তথ্যানুযায়ী বছরে প্রায় লাখ দেড়েক বাংলাদেশীর অনুপ্রবেশ ঘটছে এখানে এবং এর প্রধান অংশই আর ফিরে যাচ্ছে না।' বেসরকারী হিসেবে এ সংখ্যা আরো বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। ২৪ এপ্রিল '৯২ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ তাদের জাতীয় কাউন্সিলে দাবী করেছে যে গত দুই দশকে পঞ্চাশ লক্ষের বেশী লোক দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগ প্রসঙ্গে স্বদেশে যাই বলুন কেন, ভারতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু তারা নিজের জন্মস্থান, পূর্বপুরুষের ভিটা, মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সময় বাল্যকাল এবং বাল্যকালের স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশ প্রকৃতি; এমনকি নিজের বাবা মা যে ঘরটিতে পরলোকগমন করেছেন, সেই ঘর এবং তাদের স্মৃতিচিহ্নকে ফেলে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যাবার সময় যে অশ্রু গড়ায়, তাও গোপনে এ যে কি নিদারুণ ট্রাজেডি, তা ভূক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে অনুভব করা কঠিন। তবে এই ট্রাজেডি, হিন্দুদের এই দেশ ত্যাগের যন্ত্রণা, যদি দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সহানুভূতির সঙ্গে দেখে, তাদের প্রতি যদি সহানুভূতিশীল আচরণ করা হয় তাহলে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সংখ্যা অনেকাংশে কমে আসবে। কারণ কোন হিন্দুই এদেশ থেকে ভারতে গিয়ে ভাল করতে পারেন নি। তবে অবিভক্ত ভারতবর্ষে যাদের কলকাতা কেন্দ্রিক জীবন ছিল তাদের কথা ভিন্ন। ১৯৯১ এর আগস্টে বিক্রমপুর এলাকার নামজাদা ডাক্তার ইন্দ্রবিহারী রায় দেশত্যাগ করে চলে গেছেন। তিনি এখন কলকাতার আগরপাড়ায় অখণ্ড অবসরে দিন কাটাচ্ছেন। সেখানে তাঁর কোন কাজ নেই। কিন্তু বিক্রমপুরের মাইজপাড়ায় যখন ছিলেন, তখন রোগীর ভিড়ে তার হাঁফ ছাড়ার উপায় ছিল না। তাঁর আগরপাড়ার বাড়িতে (মাইজপাড়ার বাড়িতে তাঁদের যে গোয়ালঘর ছিল তারচেয়েও ছোট জায়গার মধ্যে এ বাড়ি) গিয়ে

প্রথমে তাঁকে চিনতে আমার কষ্ট হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। তিনি কমপক্ষে দশ বছর এগিয়ে গেছেন তাঁর বর্তমান বয়স থেকে। তিনি ফেলে রেখে গেছেন তাঁর পৈতৃক বাড়ি, যে বাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশ করার জন্যে সাতটি গেট পেরুতে হতো। কিন্তু আগরপাড়ার বাড়িতে প্রবেশ করা যায় অবাধে। ইন্দ্রবিহারী রায় কেন চলে গেছেন এদেশ থেকে জানতে চাইলে যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম, তিনি দেশত্যাগ করার কিছু দিন আগে বিনা দোষে, বিনা কারণে তাঁকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে কিছুক্ষণ থানায় রেখে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। পুলিশ দিয়ে দিবালোকে, প্রকাশ্যে সবার সম্মুখ দিয়ে থানায় নিয়ে যাবার অপমান তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি।

ইন্দ্রবিহারী রায় ভারতে চলে গেছেন এবং তিনি সেখানে ছেলেদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু যাঁরা চলে গেছেন এদেশ থেকে তাঁদের মাথা গোজার কোন ঠাঁই নেই ভারতে। কেউ খুপরির মতো ঘর ভাড়া করে থাকেন, অনেকেই থাকে বস্তিতে। শিয়ালদহ স্টেশনের আশে পাশে, কলকাতা শহরে, নদীয়ায়, চব্বিশ পরগনাসহ পশ্চিমবঙ্গের যে সব এলাকায় বস্তি রয়েছে তার অধিকাংশে বসবাস করে উদ্বাস্তরা। বাংলাদেশের হিন্দুরা। বনগাঁ থেকে শিয়ালদহের দিকে রেল লাইনের দু'পাশে যে বস্তি গড়ে উঠেছে তার বেশীর ভাগ বস্তিতে মাথা গোঁজার ঠাই করে নিয়েছেন এদেশে থেকে চলে যাওয়া হাজার হাজার হিন্দু। প্রতিদিন অন্নের সংস্থান করতে তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে টিকে থাকতে হচ্ছে। এ শুধুই টিকে থাকা, বেঁচে থাকা নয়। তবুও তাঁরা এদেশ থেকে সেই কঠিন জীবনে চলে যাচ্ছেন । চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

মূলতঃ ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালিতে সে সাম্প্রদায়িক হামলা হয় তখন থেকেই হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগজনক নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় এবং দেশত্যাগ করে ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রার সূচনা ঘটে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে এদেশের শাসক গোষ্ঠী আইনের শাসন প্রবর্তনে সক্ষম না হওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তখন দেশত্যাগের মাত্রা অনেকাংশে বেড়ে যায়। পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের আদলেই তৈরি করা হয়। আর এই বৈষম্যমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণেই ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয়মাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এগার লাখ হিন্দু ভারতে চলে যায়। এর মধ্যে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, এক লাখের কিছু বেশী কৃষক, এক লাখের কিছু কম কারিগর । বাকি উচ্চবিত্ত জমিদার - জোতদার শ্রেনী ও অন্যান্য।

গণতান্ত্রিক শক্তি যখনই ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছে, প্রগতিশীল শ্রেণী যখনই নিজেদের সংগঠিত করে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে - তখনই এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে ক্ষমতাসীনরা। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যকে ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীনরা সাম্প্রদায়িক হানাহানি, সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনকে পরিকল্পিতভাবে ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যবহার করেছে। প্রগতিশীল শক্তিকে দুর্বল করে দেয়ার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পুনরায় নিরাপত্তহীনতায় ভুগেছে

এ রকম ঘটনা এদেশে একবার নয়, অনেকবার ঘটেছে। ১৯৫০ সনের জানুয়ারি মাসে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল।

গণতন্ত্রের দাবী ঠেকানোর জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিলো মুসলিম লীগ। এদেশের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তখন আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মুসলমান এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। দুদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এতো ভয়াবহ হয়ে ওঠেছিল যে উভয় দেশের সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান এবং তাদের জীবন নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে ঐ বছর এপ্রিলের ৮ তারিখে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে একটি চুক্তি পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তির শর্তানুসারে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এদেশে আগত অধিকাংশ উদ্বাস্তুই ভারতে ফিরে যায়। ভারতে আইনের শাসন বহাল থাকায় এই চুক্তির শর্তসমূহ সেদেশে কার্যকরী হয়েছিল এবং ১৯৫০ এর পরে এদেশে ভারত থেকে আর কোন উদ্বাস্তু আসেনি। কিন্তু এদেশের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে এদেশ থেকে সংখ্যালঘুদের ভারত যাত্রা কমে এলেও বন্ধ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান সরকার চুক্তি কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। সে চেষ্টাও প্রশাসন করেনি। বরং ১৯৫১ সনে পাকিস্তানের আইন সভায় 'ঈস্টবেঙ্গল ইভাকুইন প্রোপার্টি (রেষ্টোরেশন অব পজেশান) এক্ট অব ১৯৫১' এবং 'ঈস্ট বেঙ্গল ইভাকুইস (এডমিনিস্ট্রেশন অব ইমমুভেল প্রোপার্টি) এক্ট অব ১৯৫১' নামে দুটি আইন পাশ হবার পরে হিন্দুরা নিজেদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং কার্যতঃ এদেশের হিন্দুরা নিরাপত্তাহীতায় আরো বেশী করে আক্রান্ত হয়। এই প্রশাসনিক বৈষম্যের কারণে ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়।

১৯৫২ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে পাকিস্তান সরকার ভারতে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট প্রথার প্রবর্তন করে। অবশ্য ভারতও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে এদেশের হিন্দুরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তাদের দেশত্যাগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এরপর 'ঈস্টবেঙ্গল প্রিভেনশন অব ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি এণ্ড রিমুভেবল ডকুমেন্টস রের্কডস এক্ট অব ১৯৫২' এবং ঈস্ট পাকিস্তান ডিষ্টার্বড পারসন্স (রিহ্যাবিলিটেশন) অর্ডিন্যান্স অব ১৯৫৪'– এই দুটো আইনের দ্বারা পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের মনোবল আর একবার ভেঙ্গে দেয় এবং সরকারের অনুমতি ছাড়া হিন্দু সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সম্পত্তিও বিক্রি করার অধিকার হারায়। ১৯৫৭ সনে পাকিস্তান সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী 'পাকিস্তান (এডমিনিস্ট্রেশন অব ইভাকুইস প্রোপার্টি) এক্ট xii অব ১৯৫৭'– আইন জারী করে এবং 'ইলেকটিভ বডি ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার অব ১৯৫৯' নামের একটি অমানবিক আইন প্রয়োগ করে ছয়জন বিশিষ্ট হিন্দু নেতাকে সরকারি অফিসে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় কতগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এসব কারণে হিন্দু জনগোষ্ঠী নিরাপত্তার প্রশ্নে ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ষাটের দশকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ এসব কারণে এই দশকের প্রথম পাঁচ বছরে প্রায় দশ লাখ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স' চালু করলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের দুরাবস্থা বৃদ্ধি পায়। 'ইষ্ট পাকিস্তান এনিমি প্রোপার্টি ল্যান্ডস বিল্ডিংস এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ডিসপোজাল অর্ডার অব ১৯৬৬' জারী করে প্রকৃতপক্ষে এদেশের হিন্দুদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে এদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভারত গমন অনেকাংশে কম ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় যে এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তার মধ্যে ৮০% ধর্মীয় সংখ্যালঘু। দেশ স্বাধীন হবার পরে স্বদেশের মাটিতে, স্বগৃহে ফিরে এসেছে তারা। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিরোধী শক্তি চক্রান্তমুলকভাবে দুর্গাপূজার উৎসব চলাকালীন সময় একই দিনে, একই সময়ে দেশের অধিকাংশ জায়গায় পূজামণ্ডপে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটায়। এই হামলার পরেও দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেনি। তবে ১৯৭৪ সালে শত্রু সম্পত্তি আইনের ধারা উপধারা অপরিবর্তিত রেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্য মনোরঞ্জন ধরকে দিয়ে শত্রু সম্পত্তি আইনকে অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে যে নতুন নামকরণ করেন তাতে হিন্দু সম্প্রদায় হতাশ হয়। কারণ অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রশ্রয়েই হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি জমা, বাড়িঘর দখল করা অব্যাহত থাকে।

এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ পৌরসভার একটি উদাহরণ দিলে হিন্দুদের তখনকার মানসিকতা স্পষ্ট হবে। দেশ স্বাধীন হবার পর অনেক হিন্দু নাগরিক এদেশে জায়গা কিনেছেন। বাড়ি করেছেন। ১৯৭৪ পর্যন্ত ময়মনসিংহ পৌরসভায় শহরে বাড়ি করার অনুমতি চেয়ে যে সব দরখাস্ত এসেছে তার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের দরখাস্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৯৭৪ সালের পরে এই পৌরসভায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একজনও বাড়ি করার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেন নি এবং বঙ্গবন্ধুর মতো একজন উদার, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাকাণ্ডের পরে ময়মনসিংহ শহরে যে সব হিন্দু বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছিল, তা বন্ধ রাখা হয় এবং ঐসব বাড়ি আজো অসম্পূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের তৎকালীন চিত্র থেকে ময়মনসিংহ একটি উদাহরণ মাত্র। বর্তমানে বাংলাদেশে কোন হিন্দু জমি কেনেন না, বাড়ি করার সাহস পান না। কারণ শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল করার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এদেশে হিন্দু সম্পত্তির মতো হিন্দু মেয়েরাও নিরাপদ নয়। এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দু মেয়েদেরও সম্পত্তি মনে করে। হিন্দু সম্পত্তি দখল করার অর্পিত সম্পত্তি আইনের মতো হিন্দু নারী ধর্ষণ করার কোন আইন না থাকলেও ঐ শ্রেণীটির কাছে এটা একটি মধ্যযুগীয় নিয়মে পরিণত হয়ে পড়েছে। স্ত্রী-কন্যার সম্ভ্রম রক্ষার্থেও হিন্দু সম্প্রদায় দেশত্যাগ করছেন।

মুক্তিযোদ্ধা হয়েও জিয়াউর রহমান এমন একজন রাজাকারকে প্রধানমন্ত্রী করলেন, যার উদ্যোগে এদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর পুনর্জাগরণ ঘটে। জিয়াউর রহমান নিজের গদিকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং রাজাকার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উপদেষ্টাদের পরামর্শে ১৯৭৭ সনের ২৩ এপ্রিল সংবিধান থেকে অখণ্ড জাতিসত্তার ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতাকে কাঁচি চালিয়ে বাতিল করে দেন। জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য মূলনীতিকে বিকৃত ও খর্ব করে সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা হয়। এরপর থেকেই এদেশে নতুন করে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির ধারা জোরদার হয়। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীন অবস্থার শিকার হয়। আর এ কারণেই জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের পুরো সময়টা হিন্দুদের দেশত্যাগ অব্যাহত ছিল।

জিয়াউর রহমানের পরবর্তী সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের কিছুদিন পরেই (২২ ডিসেম্বর ১৯৮২) প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'ইসলাম ও কোরানের নীতিই হবে দেশের নতুন সংবিধানের ভিত্তি'। ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ অসহায়বোধ করতে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়কে নিজের দলে টানার উদ্দেশ্যে এই ধোঁকাবাজ সামরিক জান্তা ১৯৮৪ সনের ২১ জুন ঘোষণা করেন, অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় আর কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে না। তার এটা ছিল শুধুই বলার জন্যে বলা। কারণ জেনারেল এরশাদের এই আদেশ জারীর পর প্রথম দিকে পিছনের তারিখ দিয়ে এবং কিছুদিন পরে পূর্বের মতোই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের প্রচুর সম্পত্তি এই কালো আইনের আওতায় কেড়ে নেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৮৭ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। জেনারেল এরশাদের শাসন আমলের আর একটি কলঙ্কিত দিক রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা। ১৯৮৮ সনের জুনে এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে সংবিধানের অর্ন্তভুক্ত করার পরে সাম্প্রদায়িক শক্তি উৎপীড়নে আরো বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার পরে এদেশের মৌলবাদীরা ঘোষণা করে, এদেশে থাকতে হলে সবাইকে মুসলমান হতে হবে। তৎকালীন পত্রপত্রিকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত এসব জঘন্য উন্মাদনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'সাপ্তাহিক একতা' লিখেছে, "রাষ্ট্রধর্ম' বিল পাস হবার পর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার সহবাস গ্রামের হিন্দু ঋষি সম্প্রদায়ের বাড়িঘরের আশে-পাশের গ্রামগুলোর চার-পাঁচশো দুষ্কৃতিকারী হামলা চালায়। হামলার সময় তারা চিৎকার করে ঘোষণা করে 'সরকার দেশে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করেছে। তাই ইসলামী দেশে থাকতে হলে তোদের সবাইকে মুসলমান হতে হবে। মুসলমান না হলে এদেশ ছেড়ে তোদের চলে যেতে হবে। হামলাকারীরা ঋষিদের প্রতিটি ঘর লুট করে আগুন লাগায়, মন্দির ভাঙে, মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। অনেককে ধরে নিয়ে যায়, যাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে এরকম আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। এরশাদের শাসন-আমলে ১৯৮৯ সনে বাবরী মসজিদ-রামমন্দির বিতর্ক নিয়ে এদেশের হিন্দুদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তার প্রেক্ষিতেও বহু হিন্দু দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বাবরী মসজিদ-রামমন্দির বিতর্ক কেন্দ্রিক পরিস্থিতিতে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়, তার প্রেক্ষিতেও বহু হিন্দু দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার পরে এদেশে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর বীজ বপন করে গিয়েছেন। আর জেনারেল এরশাদ সেই বীজ অঙ্কুরিত হবার পরে সযত্নে মহীরুহে পরিণত করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এরশাদ একমাত্র শাসক যিনি সাম্প্রদায়িকতাকে সবচেয়ে বেশি ইন্ধন যুগিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন। তাঁর শাসন আমলে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত এদেশ থেকে প্রায় ছত্রিশ লক্ষ হিন্দু দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে। এই হিসেবের বাইরে রয়েছে তার শাসন আমলের ৯০ এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দুর নাগরিকের দেশত্যাগের ঘটনা।

খালেদা জিয়ার শাসন আমলে ১৯৯২ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে এদেশের হিন্দুদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয় তা অবর্ণনীয়। ১৯৯২-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে এদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু নিজেদের জীবন, মান, সম্ভ্রম ও ধর্ম রক্ষার্থে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ চরম বিপদের সময় তার ধর্মীয় অবতারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় যখন দেখেছে তাদের চরম বিপদে যে দেবদেবী অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস হবার কথা, সেই দেবদেবীর মূর্তিকে অন্য ধর্মের লোকেরা ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে, তখন তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি অসহায় বোধ করেছে। আর তখনই নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের সন্ধানে দেশত্যাগ করার প্রবণতা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠেছে।

বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ঘটনা সম্পর্কে ০৭.০১.১৯৯৪ তারিখের Holiday পত্রিকা 'The Missing population' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেখানে বলা হয়েছে, 'This missing population' was about 1.22 million during the period of 1974-81, about 1:73 million during the last inter-censal period of 1981-91.As many as 475 Hindus are disappearing everyday from the soil of Bangladesh on as average since 1974.'

প্রতিদিন গড়ে যদি ৪৭৫ জন হিন্দু দেশত্যাগ করে চলে যায়। তাহলে প্রতিবছর ১৭৩৩৭৫ জন হিন্দু নীরবে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ১৯৯১ সনের জনগণনার হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৭.৪% মুসলিম। ১০,৫% হিন্দু। ২.১% খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু ১৯৭৪-এ হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১৩.৫%, ১৯৫১ তে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ২২.০%।

ফাদার টিম (Father R.W. Timm C.S.C) সম্পাদিত State of Human Rights 1994 Bangladesh শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বামাসপ থেকে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থে লেখা রয়েছে- The Hindu population in Bangladesh stood at 1.25 crore (12,419,195) in 1991 of course, the Population growth rate in the Hindu community is relatively lower than that of the Muslims, because the custom of remarriage of widows in the Hindu community is almost absent. Apart from that the Hindus feel easier about accepting family planning methods to keep their family small. For these reasons the population growth rate among the Muslims is much more than that for the Hindus. There have been no statistics prepared in this regard in Bangladesh. Even if the birth rate were calculated at two percent less in case of the Hindu community compared to the Muslims, the number of Hindus living in this country should have been about 3.25 crore, but it is only 1.25 crore. That is, the number of Hindus has been reduced by two crore in the last 50 years (till 1991). The most likely explanation is that they have left the country.'

হিন্দুদের দেশত্যাগ অব্যাহত গতিতে চলছে একথা কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। এদেশ থেকে প্রতিদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক যে চলে যাচ্ছে এই প্রসঙ্গে আরো কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৯৭৪ সনে ফরিদপুর জেলায় জনসংখ্যা ছিল ৯,৪৪,০০০। কিন্তু ১৯৮১ তে এই সংখ্যা এসে নেমেছে ৮,৯৪০০০-তে। এই জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে ৫.৩০%। পক্ষান্তরে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ২৪.২৬%। হিন্দুদের জন্মহার শূন্য ধরে এই হিসাব করা হয়েছে। যদিও তা অবাস্তব। তবুও জন্মহার শূন্য ধরার পরেও দেশের একটি মাত্র জেলা থেকে মাত্র সাত বছরে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু দেশ ত্যাগ করেছে। এই চিত্র বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার। সংখ্যার দিক থেকে হয়তো কোথাও কম, কোথাও বেশি। যেমন রাজশাহী জেলায় উল্লেখিত সাত বছরে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে ৫৫ হাজার। কিন্তু কোন জেলায়ই হিন্দুদের দেশত্যাগের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেই। যদি কোন হিন্দু দেশ ত্যাগ না করতো তাহলে এদেশে এখন হিন্দু জনসংখ্যা দাঁড়াত সোয়া তিন কোটি। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা মাত্র সোয়া কোটি।

হিন্দুদের এই দেশত্যাগ রোধ করা সম্ভব এবং তা খুব সহজেই। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, হামলা ও বৈষম্য, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনসহ সব রকম কালো আইন ও

বৈষম্য তুলে নিলে, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকলে হিন্দুদের দেশত্যাগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে না গেলেও বহুলাংশে কমে যাওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া এদেশে কোন হিন্দু, সে যত মেধা সম্পন্নই হোক না কেন কোন অবস্থাতেই সে আশা করতে পারে না প্রশাসনের সচিব হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হবে, সেনাবাহিনীর প্রধান হবে কিংবা ব্যাংকের এমডি হবে। এ রকম হবার নজীর নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র অতি সূক্ষভাবে হিন্দুদের এগুলো না হবার একটি অঘোষিত নিয়ম করে রেখেছে।

এই বৈষম্য ও নির্যাতনের ক্ষত নিয়ে এদেশের নাগরিক চলে যাচ্ছেন, এ লজ্জা কার? আমার, আপনার, এদেশের প্রতিটি মানুষের। প্রচন্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ আর ফিরে আসে না তার জন্মভূমিতে, তার পূর্বপুরুষের ভিটায়। তারপরেও কেউ কেউ আসেন, বেড়াতে। যেমন এসেছিলেন মৃণাল সেন। আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ফরিদপুরে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে। মৃণাল সেন যখন কয়েক দশক পরে নিজের জন্মভিটায় পা রেখেছিলেন, তখন তিনি নিজকে সংযত রাখতে পারলেও তাঁর বোন প্রয়াত রেবা সেনের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি। শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে ওঠেছিলেন। এদেশ থেকে যে সকল হিন্দু চলে গেছে তাদের প্রত্যেকের এ রকম স্মৃতি, এরকম ভালবাসার স্থান, এরকম রেবা সেন বুকের ভিতরে ডুকরে কেঁদে ওঠে অহর্নিশ।

এই গ্রন্থে উল্লিখিত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব

১। সংবিধান থেকে যে ধর্মনিরপেক্ষতা পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তুলে দেয়া হয়েছিল, তা পুনরায় সংবিধানে সংযোজন করতে হবে। অর্থাৎ ১৯৭২ এর সংবিধানে ফিরে যেতে হবে।

২। শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে এবং দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে।

৩। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধান থেকে তুলে দিতে হবে। কারণ ধর্ম ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পরিচর্যার বিষয়। অর্থাৎ ১৯৭২ এর সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।

৪। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাসহ যে কোন ধর্মের যে কোন ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সারা দেশে সর্বস্তরে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যে কোন ধর্মীয় বিষয় পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে এবং 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি' নামে একটি পাঠ্যক্রম বাধ্যতামূলক করা হোক। সেই সঙ্গে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্রমের প্রচলন করতে হবে।

৬। কোন সম্প্রদায়ের জন্যই আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস থাকা চলবে না। যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন ছাত্রছাত্রী নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারবে এবং ছাত্রাবাস বা ছাত্রীনিবাসে থাকতে পারবে।

৭। সরকারি চাকরিতে শিক্ষিত জনসংখ্যার হারে নিয়োগ দিতে হবে এবং ভাইভা বা মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন তুলে দিতে হবে। প্রমোশনের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ সাম্প্রদায়িক আচরণ বন্ধ করতে হবে।

৮। ধর্মীয় সংস্থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার বা দায়িত্ব দেয়া চলবে না এবং ধর্ম-নির্দিষ্ট কোন পোষাক পরে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৯। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং যে কোন ধর্মসঙ্গীত, মিলাদ, ওয়াজ, পূজানুষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ করতে হবে।

১০। ধর্মীয় খাতে সব রকম সরকারি অনুদান বন্ধ করতে হবে এবং কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক আলোচনা বা চর্চার নজীর পাওয়া গেলে সেই উপাসনাগারটিকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট বাতিল করে ফাউন্ডেশন করতে হবে।

১১। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা করাকে মারাত্মক অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং এই অপরাধের জন্যে কঠোর শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

১২। সরকারি কোন অনুষ্ঠানে ধর্মীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের যোগদান এবং ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৩। যে কোন নির্বাচনে ধর্মীয় নেতাদের যে কোন ভূমিকা রাখা নিষিদ্ধ করতে হবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

১৪। সরকারিভাবে ধর্মসংক্রান্ত কোন বই, পুস্তিকা, লিফলেটসহ যে কোন প্রকাশনা বন্ধ করতে হবে।

১৫। কোন পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক সংবাদ প্রকাশিত হলে সেই পত্রিকার সরকারি ডিক্লারেশন স্থায়ীভাবে বাতিল করে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়ার আইন থাকতে হবে।

১৬। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আয়কর দিতে হবে এবং এছাড়াও আয়ের অর্ধাংশ রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের ত্রাণ তহবিলে জমা দিতে হবে যাতে দুঃস্থ ও বিপদাপন্ন মানবতার সেবায় উক্ত টাকা ব্যয় করা যায় তার বিধান থাকতে হবে।

১৭। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পানি, বিদ্যুৎসহ যে সকল সরকারি সুবিধা দেয়া হয়েছে তা বন্ধ করে দিতে হবে এবং সেই টাকা দিয়ে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮। রেডিও টেলিভিশনে হামদ নাতের পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কে আলোচনা করার ব্যাপক সুযোগ থাকতে হবে।

১৯। বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় যেমন- জারিগান, পালাগান, কীর্তন, পল্লীগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত ইত্যাদি ব্যাপকভাবে রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২০। যে কোন অবস্থায় রাষ্ট্রাদর্শ থেকে ধর্মকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।

২১। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আইন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশ

ক. State of Human Rights 1994 Bangladesh.
Chief Editor : Father R.W. Timm C.S.C
Published by : BMSP/CCHRB. 5/4 Block-F. Lalmatia
Dhaka, January, 1995

খ. Communal Persecution and Repression in
Bangladesh : some Facts
Published by : Bangladesh Hindu Bouddha Christian
Oikaya Parished
5, Tejkuni Para Dhaka, April, 1993

গ. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ঃ তথ্য ও দলিল
প্রকাশক ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ,
৫, তেজকুনী পাড়া, ঢাকা, মে ১৯৯৩

ঘ. Communal Persecution and Repression in Bangladesh :
Some Facts volume 2
Published by : Bangladesh Hindu Bouddha Christian
Oikya Parishad, 5, Tejkuni Para Dhaka, August 1995

ঙ. প্রসঙ্গ রামমন্দির-বাবরি মসজিদ, মধু গোস্বামী ও মজহারুল ইসলাম, নবজাতক
প্রকাশন, এ ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৩

চ. বাংলাদেশ! বাংলাদেশ!! শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়
সমতট প্রকাশন, ১৭২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা

ছ. ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা, অধ্যাপক অমলেন্দু দে,
রত্না প্রকাশন, ২/৭৬, বিবেকানগর, কলকাতা, ১৯৯২

জ. Human rights and their relation to
law and development
Published by : Father R.W. Timm C.S.C. Dhaka July '92

ট. State of Human Rights 1995, '96 and '97 Bangladesh. Chief
Editor : Father R.W. Timm C.S.C
Published by : BMSP/CCHRB, 5/4 Block-F.,
Lalmatia Dhaka, January, 1996, April, 1997 & April 1998

পত্রপত্রিকা

১. Holiday, 07. 01. 1994
২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪
৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ১৯৯৪
৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ জুলাই থেকে ১১ জুলাই ১৯৯৫
৫. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ১৯৯৫
৬. পরিষদ বার্তা, ২০ জানুয়ারি ১৯৮৯
৭. পরিষদ বার্তা, ৬ এপ্রিল ১৯৮৯
৮. পরিষদ বার্তা, ১ অক্টোবর ১৯৮৯
৯. পরিষদ বার্তা, ১ মার্চ ১৯৯০
১০. পরিষদ বার্তা, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
১১. পরিষদ বার্তা, ২৩ এপ্রিল ১৯৯২
১২. পরিষদ বার্তা, ১১ জানুয়ারি ১৯৯৩
১৩. পরিষদ বার্তা, ২০ অক্টোবর ১৯৯৩
১৪. পরিষদ বার্তা, আগস্ট সংখ্যা ১৯৯৪
১৫. পরিষদ বার্তা, এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯৫
১৬. চতুরঙ্গ, শ্রাবণ ১৪০১ কলকাতা
১৭. পরিষদ বার্তা, আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৯৬
১৮. পরিষদ বার্তা, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৬, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৭
১৯. পরিষদ বার্তা, মার্চ ১৯৯৮
২০. দৈনিক ভোরের কাগজ, ০২,০৩ এপ্রিল ১৯৯৮